কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

২৮, শাঁখারীটোলা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা ;
১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্র হইতে
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত।
১৩০২ সাল।

মূল্য ৵ আনা।

উৎসর্গ।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য, মহানুভব,

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ

ডাক্তার

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম্., ডি., সি., আই., ই

মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ নামে

ভক্তিপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকার।

শুদ্ধিপত্র
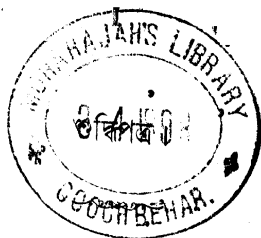
পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	৯	যে অঞ্চলের	সে অঞ্চলের
১৭	৭	সে উচ্চ	যে উচ্চ
১৮	৬	কোর্টে	কোরটে
১৯	২	বল্যসখা	বাল্যসখা
৩০	১৫	চৌকীর	চৌকার
৫৪	১৩	reasons	reason
৬৬	৯	হিন্দিতে	ইঙ্গিতে
৯৮	২০	মেম সাহেবদের	মোসাহেবদের
১১৫	৪	অক্সরের	অপ্সরের

কৃতজ্ঞতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্রভূমে, পদ্মাতীরে কুন্তলা নামে প্রাচীন গ্রাম। ইহাঁর সুখ সম্পদের দিনে পদ্মা প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে বহিয়া যাইত, কিন্তু কালে সে ব্যবধান দূর হইয়া গেল। পদ্মার ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলার অদৃষ্টও ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। জমীদার মৈত্রবংশের দুই শাখায় তুমুল মোকদ্দমা বাধিয়া গেলে বড় তরফের বংশধর হরিনাথ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং চারি বছরের একটী পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। বিষয় আশয় সব কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের জিম্মা হইল। ওদিকে ছোট তরফের বাবু প্রমথনাথ খুব উৎসাহে লড়িতে লাগিলেন। মোকদ্দমা জেলা-কোর্ট হইতে হাইকোর্টে, সেখান হইতে প্রিভিকৌন্সিলে, দুই পক্ষের বিস্তর অর্থ গ্রাস করিয়া হবিপুষ্ট হুতাশনের মত বাড়িতে বাড়িতে চলিল। কেহ মিটমাটের কথা তুলিলে মৃত-দার প্রমথনাথ বলিতেন, "আমার একটা মেয়ে বই ত আর কেউ নেই, হারি জিতি নাহি লাজ। ভাল দেখাই যাক্ না শেষ কোথায়?" বাস্তবিক মেয়েটীর জন্মাবধি দুই সরিকের কলহেরও সুরু, এবং তাহার বিবাহের লগ্নপত্র, এমন কি "করণ"

হইয়া গেলেও, সে আগুণ নিভিবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। সহসা একদিন খবর আসিল, বাক্‌দত্ত পাত্রের মৃত্যু হইয়াছে। বারেন্দ্রব্রাহ্মণকুলে বাক্‌দত্তা কন্যার পক্ষে ইহা বৈধব্যতুল্য। এইরূপ অপরিণীতা বিধবাদের জন্য নিকৃষ্ট বিবাহ চলিত আছে বটে, কিন্তু সমাজে সেটা বড় হেয়। তাঁহার আদরের সুরবালা পতিতা হইবে, ইহা ভাবিতে প্রমথনাথ অবসন্ন হইতেন। তার পর বছর ফিরিতে না ফিরিতে সংবাদ আসিল, প্রিভিকৌন্সিলে বড় তরফের জিৎ হইয়াছে। আর সহিল না, ভগ্নহৃদয়ে প্রমথনাথ এ সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বার বছর বয়সে সুরবালা পিতৃহীনা হইল। সমাজের আইনে বিবাহ না হইতেই তার আগে তাহার বৈধব্য ঘটিয়াছিল; পিতা নগদ অর্থ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; ভূমি-সম্পত্তি যথেষ্ট থাকিলেও মোকদ্দমা খরচার দায়ে সর্ব্বস্ব যায় যায় হইল। পরামর্শ দিবার বড় কেহ ছিল না। পিতার আমলের কর্ম্মচারীরা বেগতিক দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই সরিয়া পড়িল—কেন না, তাহারা বুঝিল, অতঃপর বড় তরফের সঙ্গে শত্রুতা রাখিলে তাহাদিগকে সে অঞ্চলে বসবাস উঠাইতে হইবে। দুটা লোক কেবল ততটা হিসাব করিয়া চলিতে

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পারিল না—তাহার একটী প্রমথনাথের জমাদার অকালীসিং, অপরা ভগবতী নামে দাসী, সে সুরবালাকে মানুষ করিয়াছিল।

অবস্থা যখন এইরূপ, তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া, একদিন অকালী সিং জেলার সদরে গিয়া কালেক্টর সাহেবের কাছে দরখাস্ত দিল। মোক্তার বলিল যে, তাহার যখন আম-মোক্তার-নামা কি কোন রকমের ক্ষমতাপত্র নাই, তখন নাবালিকার পক্ষে সে কোন দরখাস্ত দিলে নামঞ্জুর হইয়া যাইবে। অকালী সিং সে কথা না বুঝিয়া বিচিত্র হিন্দী বাঙ্গালায় মোক্তারকে বলিল যে, সে যাহা যাহা বলিতেছে, তাহারই ঠিক এবারতে তিনি দরখাস্ত লিখিয়া দিন, মঞ্জুরি বা নামঞ্জুরি সম্বন্ধে কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে তার বোঝাপাড়া আছে। দীর্ঘমূর্ত্তি, পাকা জুলপিদার ভোজপুরিয়াটা এই কথা বলিয়া মোক্তার সাহেবের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিলে, তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঠিক তাহার কথাগুলি দরখাস্তে বসাইয়া দিলেন, এবং পূর্ব্বে কস্মিন্‌কালে পরিচয় না থাকিলেও সনাক্ত করিলেন, "জানি চিনি।" সেই তীক্ষ্ণকটাক্ষ মোক্তার মহাশয়ের হৃদয়ে এমনই বিঁধিয়া গিয়াছিল যে, এত করিয়াও তিনি অকালী সিংহের কাছে নিজের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। অকালী কিন্তু নিজে হইতে তাঁহাকে এক টাকার যায়গায় দুই টাকা দিয়া স্মিতমুখে সুধাইল, "ক্যা বাবু সাহাব! খুসী হুয়া না?"

কৃতজ্ঞতা।

"সওয়ালযানির" সময় সকলের আগে অকালী সিং কালেক্টর সাহেবের সমীপবর্ত্তী হইল। কালেক্টর ডোনাল্ড সাহেব্ তখন মাথা গুঁজিয়া লিখিতেছিলেন; চশ্‌মাচক্ষে এজ্‌লাসের নীচে চাহিবামাত্র নিত্যপরিচিত একঘর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন লোকের মধ্যে একটা মানুষের মতন মানুষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কাজেই তিনি সর্ব্বাগ্রে অকালী সিংকে ডাকিয়া তাহার নালিশটা কি শুনিতে ব্যস্ত হইলেন। অকালী সুশিক্ষিত সৈন্যের মত গ্রীবা উন্নত করিয়া সাহেবকে সেলাম করিল, এবং দৃঢ়হস্তে তাঁহাকে দরখাস্তখানি দিল।

সাহেব দরখাস্তের উপর চক্ষু বুলাইয়া লইয়া পেশ্‌কারকে পড়িতে বলিলেন। এবং সকল শুনিয়া অকালী সিংহকে সুধাইলেন যে, নাবালিকার পক্ষে তাহার কোন ক্ষমতাপত্র আছে কি না?

অকালী সিং এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল বটে, কিন্তু সহসা "না" বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিল। এবং বলিল যে, এক দাসী ছাড়া এই বালিকার এ সংসারে আর কেহ নাই। হরানন্দ তালুকদার বড় তরফের মোক্তার এজলাসে উপস্থিত ছিলেন, দরখাস্ত পাঠ শেষ হইলে বুঝিলেন, ব্যাপারখানা কি? অমনি পেশ্‌কারের সঙ্গে তাঁহার চোকের কোণে কি কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। হিন্দুস্থানীটা সাহেব বাহাদুরের কথায় ঠিক উত্তর দিল না দেখিয়া পেশ্‌কার হাঁকিলেন, "যো বাৎ পুছা গিয়া উঁস্‌কা সাফ্ জবাব করো।" সাহেব বলিলেন, "আচ্ছ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বলিতে দাও।” অকালী উৎসাহিত হইয়া বলিল, “না, ক্ষমতা-পত্র নাই। আমার মৃত মনিব তাঁহার একমাত্র কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গেছেন। নারায়ণ জানেন, সেই আমার ক্ষমতাপত্র।” তাহার সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই কয়টী কথা শিক্ষিত বাগ্মীর মত শুনাইল। ডোনাল্ড্ মনে মনে বক্তার প্রভুভক্তির প্রশংসা করিলেন।

সাহেব বলিলেন, “অকালী সিং! তোমার মনিব বলিতেছ বালিকামাত্র। আমার সমক্ষে তাহাকে আনিতে পার?”

অকালী একটু ভাবিল বটে, কিন্তু মুহূর্ত্তে উত্তর দিল, “হুজুর! তিনি বালিকা হইলেও বড়ঘরাণা, আপনার কাছে আসিতে তাঁর ইজ্জতের হানি হইবে। এখন যে আপনার মর্‌জি।”

কালেক্টর দরখাস্তে হুকুম লিখিলেন। হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, আমি শীঘ্র মেম সাহেবকে লইয়া তোমার মনিবকে দেখিতে যাব। আজ তুমি যাও। পূর্ব্বাহ্নে খবর পাইবে।” অকালী সেলাম করিতে না করিতে সাহেব তাহাকে অভি-বাদন করিলেন। হরানন্দ তালুকদার উকীল কামিনী বাবুর কানে কানে বলিলেন, “ঐগো, মেড়ুয়াবাদীটে জমকাল চেহারায় সাহেব ভুলাইয়া গেল।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
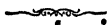
স্নান করিয়া সামান্য "ফুটাহা" খাইয়াই অকালী সিং অতঃপর গৃহে ফিরিল—কেন না, কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেলে "সুরোদিদির" অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া যাওয়াতে, কিছুই তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না। অতি প্রত্যূষে ভগবতী দাসী শয্যাত্যাগ করিবার আগেই লাঠির মাথায় বস্ত্রখণ্ড এবং "আঙ্গোছা" বাঁধিয়া লইয়া অকালী জমাদার নিঃশব্দে "দেউড়ী" ছাড়িয়া গিয়াছিল। "জেনানার" পেটে কথা থাকে না, এই ধ্রুব বিশ্বাসে, জমাদার, মনিবের চিরসুখদুঃখভাগিনী "ভগী"-কেও কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে নাই। অতএব অকালী সিং কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া পথ চলিতেছিল।

এ দিকে অকালী সিংএর অনুপস্থিতিতে ছোট তরফের সেই প্রায় জনশূন্য বৃহৎ বাটী আজ সমস্ত দিন আরও নির্জ্জন মনে হইতেছিল, এবং তাহার সেই ক্ষুদে মনিবটী নানা অছিলায় হুলুস্থূল বাধাইতেছিল। প্রহর বেলা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যখন অন্দর হইতে "দেউড়ী"র দিকে দুইবার আসিয়া সুরবালা জমাদারকে দেখিতে পাইল না, তখন ভগী দাসীর কাজকর্ম্ম বন্ধ হইবার যো হইল। ভগী যত বলে, "সে তাকে বলে যায় হয় ত কোন মাহালে গেছে", সুরবালার ক্ষুদ্র হাতের

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অজস্র কিল চাপড় তত তার পৃষ্ঠে এবং গণ্ডে বর্ষিত হয়। দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইলে বালিকা চোকের জলে ভাসিতে ভাসিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল, বামুন ঠাকুরাণী স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিতে আসিলে "জবাব" লাভ করিল। আমি বিধবা মানুষ, আপনি রেঁধে খাব, তুমি আমার রাঁধিতে এসো কেন গা? জমাদার যদি আবার ফিরে আসে, তবে তোমাদের সবাইকে মজা দেখাব।" ভগী দাসী বলিল, "যুয়ায় না খুকি, অমন অলক্ষণে কথা মুখে এনো না। ষাট্, ষাট্, আপনাকে বিধবা ব'লে গাল দিতে নাই। তোমার বিয়েই হয় নি, অমন কত হয়!" এ কথায় সুরবালা ক্ষুদ্র সিংহিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং আপনার আলুলায়িত কুন্তলদাম বাঁধিতে বাঁধিতে ভগীকে দু কথা শুনাইয়া দিল।—"মর্, আমি কি না তোর মতন কৈবর্ত্তের মেয়ে, তাই আবার বিয়ে হবে!" ভগী সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া তার আদরের সুরোর অসংযমিত কেশরাশির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল, এবং জানালা হইতে সুবাসিত তৈল লইয়া তাহা নিষিক্ত করিতে করিতে বলিল, "কেন কুকি, হরি সান্যালের বেটীর ত আবার বিয়ে হয়েচে, এবার শুন্‌চি ছেলেও হবে!" আয়ত চক্ষু দুটিকে আয়ততর করিয়া বালিকা জানালা-স্থিত তৈলবাটিকায় পদাঘাত করিল, এবং দাসীর হাত হইতে সজোরে আপনার চুলগুলি টানিয়া লইল। বলিল, "সে শতেক-খোয়ারীর কথা আমার সাম্‌নে তুই বল্‌তে পাবিনে।" ভগী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই হবে, আর বল্‌বো না।" সুরবালা

তাহার হাসি দেখিয়া আরও জ্বলিয়া গেল, এবং ভগী দাসীকে শাসাইল, জমাদার ফিরে এলে মজা দেখাবে।

বেলা পড়িয়া আসিলে হঠাৎ সুরোর মনে হইল, হয় ত বড় তরফের লোকেরা তাহার জমাদারকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কথাটায় তাহার এমনি বিশ্বাস হইল যে, সে ভগীকে কাছে ডাকিয়া তাহার কানে কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক মাথা মুণ্ডু পরামর্শ করিল। সুরোর বুদ্ধি শুদ্ধির উপর বুদ্ধিমতী শ্রীমতী ভগবতী দাসীর আঠার আনা নির্ভর, অতএব সে "তা হবে" বলিয়া তাহার ছল ছল বড় বড় চোক দুটীর উপর অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

উভয়ের যখন এই অবস্থা, অকালী সিং তখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, সুরবালা জমাদারের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভগী বলিল, "ছি, কুকি, এখন বড় হতে চল্‌লে—এখন আর ও সব যুয়ায় না কুকি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বড় তরফের আমলা ফয়লার অধিকাংশ জেলার সদরে ম্যানেজারের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিত। স্বয়ং কর্ত্রী হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী নাবালক ছেলে দীনেন্দ্রনাথ এবং একপাল কু পোষ্য লইয়া

মাষ্টার মহাশয় এবং পণ্ডিত মহাশয় অতঃপর কাজে কাজেই আপনাদের বিদ্যার বোঝা ন'বছরের নাবালকটীর উপর চাপাইতে লাগিলেন। শীতকালের প্রভাতে নবীন সূর্য্যের হিরণ কিরণহিল্লোলে যখন হরিপ্রিয়ার সোণার গোপাল দুলিতে থাকে, এবং সদ্যোত্থিত বুলবুলিগুলির লড়াই সুরু হইয়াছে মাত্র, তখন কিনা ষাট টাকার বিধু মাষ্টার ফার্ষ্ট বুকের পাতা খুলিয়া তার উপর চোক গরম করে! দুপুর বেলায় সোণার যাদু গ্রহবাজ কবুতরগুলিকে উড়াইয়া দিয়া যখন একমনে ছাদে দাঁড়াইয়া নীল আকাশে তাহাদের "উলটা-বাজি" দেখিতে দেখিতে উল্লাসে করতালি দিতেছে, কোথা হইতে হরিশ পণ্ডিত আসিয়া তখন জুড়িয়া বসিল; এবং "কোকার" সকলের সেরা কবুতর জোড়াটী সেই অবসরে বাজপক্ষীর নখবিদ্ধ হইয়া দীঘির জলে পড়িয়া গেল। এ সকল "জুলুম" ক্রমে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সহিষ্ণুতা ছাড়াইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কালেক্টর সাহেবের ভয়ে প্রথম প্রথম তিনি কিছু বলিতে পারিতেন না। রোজ "কোকন" মাষ্টার পণ্ডিতের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াই মার কাছে তাঁহাদের শাসনের আঁটা-আঁটির নানা নালিশ রুজু করে, এবং কোন প্রতীকার হয় না দেখিয়া, বিস্তর জিনিস ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রতিশোধ লয়। কর্ত্রী কেবল কাঁদেন, আর শিক্ষকদ্বয়কে মিষ্টান্ন এবং বস্ত্রাদি উপহার দিয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপে বৎসর ঘুরিয়া আসিল। দীনেন্দ্র অনেকগুলি নূতন রকমের

খেলা এবং দুষ্টুমিতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও, মাষ্টার পণ্ডিতের চাকরী বজায় রাখিবার দিকে আদৌ মনঃসংযোগ করে নাই। অতএব বছরের শেষাশেষি দু' জনেই হরিপ্রিয়া-দুলালের কর্ণ এবং গণ্ড প্রায় ইজারা-মহল করিয়া তুলিলেন। হরা খানসামা এক দিন মুখ ভার করিয়া কর্ত্রীকে জানাইল, "কত্তা, কত দুক্ষের কোকন, দুদিকে দুটো মাষ্টার পণ্ডিত তাকে ছেঁড়াছিঁড়ি করে, রোজ রোজ ত চখে দেখা যায় না।" হরার সে দিন দুই টাকা মাহিনা বাড়িয়া গেল। দেখিয়া চাকরাণী বিনোদা তার দুদিন পরে কাঁদিয়া বলিল, "মা, বলি কোকনকে অত করে' মানুষ করেছিলাম, সে কি এই শাস্তির জন্যে? আমাকে দেখানর জন্যেই যেন মাষ্টার পোড়ারমুখো বাছার গলা টিপে দিলে! আহা টুকটুকে গাল থেকে কত রক্তই বেরুল!"

এইরূপে কর্ত্রীর অপত্যস্নেহ ক্রমে সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর মত অসংযত হইয়া উঠিল। কালেক্টর সাহেবের খাতির ভুলিয়া তিনি মাষ্টার পণ্ডিতকে ডাকাইলেন, এবং বলিয়া দিলেন যে, তাঁর কোকনের গায়ে হাত তুলিলে তাঁহাদের ভাল হইবে না। তাঁর ছেলে কিছু দুঃখীর সন্তান নয় যে, লেখাপড়া না শিখিলে তার সংসার চলিবে না।

কিন্তু কর্ত্রীর রাগ অভিমানের ভয় অপেক্ষা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের লাল মুখখানার আতঙ্ক শিক্ষকযুগলের হৃদয় অধিকতর অধিকার করিয়াছিল,—ক্রমে উভয়েই ইহার পর বেত ধরি-

লেন। তাহার ফলে তাঁহারা বাসায় ফিরিয়া গিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তনের সময় প্রায় প্রত্যহ দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের উপযুক্ত ছাত্র নানা রঙের নানা ছাপে তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যার পর বাসায় ভূতেরও ভারি দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইল। তাহাতেও চাকরীর মায়া কাটে না দেখিয়া, স্বয়ং অগ্নিদেব এক দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের শয়নগৃহের "চাল" আশ্রয় করিলেন। অনেক লোক আসিয়া পড়াতে ভাগ্যে ভাগ্যে প্রাণ দুটো বাঁচিল বটে, কিন্তু "উপাধি" এবং দেহ ছাড়া আর সবই পুড়িয়া গেল। অতঃপর বলা বাহুল্য আপন আপন প্রাণ বাঁচাইয়া পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্য উভয়েই গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড় তরফের "কোকনের" পোয়াবারো—সারা দিনই ছুটী এবং সারা দিনই খেলা। বুলবুলি, শালিখ, কবুতরে কোকনের খেলিবার ঘর সকল ভরিয়া গেল, এবং মাষ্টার পণ্ডিতের দগ্ধীভূত বাসার উপরে তাহার ছাগ ও "লড়াইয়ে" মেষের ঘর তৈয়ারি হইল।

মাষ্টার পণ্ডিতের হাত হইতে পুত্ররত্নকে উদ্ধার করিয়া, হরিপ্রিয়া দেবী অতঃপর ঘন ঘন এবং অধিক জাঁকের সহিত

শিবস্বস্ত্যয়ন এবং পঞ্চদেবতার পূজা দিতে লাগিলেন। রাগ অভিমানের বেগ সংযত হইয়া আসিলেই, কালেক্টর সাহেবের বিভীষিকা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কর্ত্রী মনে ভাবিতেন, তিনি যদি বড়মানুষের ঘরে না পড়িয়া গরিব গৃহস্থের বউ হইতেন, তা' হলে নিজের ছেলের উপর তাঁহার দাবি দাওয়া থাকিত। এক একবার মনে হইত, নিজের অলঙ্কারগুলি লইয়া নৌকা করিয়া সসন্তান এমন দেশে চলিয়া যাইবেন, যেখানে তাঁর কোকনের উপর কালেক্টর সাহেবের কোন জোর খাটিবে না। কিন্তু তার পরেই মনে হইত, নৌকায় উঠিলে তাঁর গা-বমিবমি করে, নৌকাগুলো বড় টলে, আর "কোকন" লাফাইয়া তার "ছইয়ে" উঠিতে যায়!

ক্রমে এমন হইল যে, কালেক্টর সাহেব দীনেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া যাইতে না পারেন, এই উদ্দেশে কর্ত্রী তাহাকে আর বড় বাহিরে যাইতে দেন না। সেই মাষ্টার এবং পণ্ডিতকে অনেক দিন তিনি মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা এক দিন মনে হইল, তাহাদের খোঁজ করিয়া কিছু টাকা পাঠাইয়া তাদের মুখ বন্ধ করিবেন। নহিলে তারা যদি কালেক্টর সাহেবের কাছে "চুক্‌লি" করে, তবে আর কোকনের কোন মতে নিস্তার নাই। অতএব জায়গীরের আমলা এক জন টাকার তোড়া লইয়া মাষ্টার পণ্ডিতের অনুসন্ধানে চলিয়া গেল।

এদিকে মাষ্টার বিধুভূষণ বাবু বাড়ী যাইবার সময় পশ্চাতে

চাহিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই বটে, কিন্তু বাড়ী গিয়া উত্তেজিত হৃদয় কতক শান্ত হইলে বিবেচনা করিলেন, পণ্ডিতের দৌড় নর্ম্ম্যাল স্কুল পর্য্যন্ত বই নয়, কিন্তু তিনি একটা "গ্রাজুয়েট", যে সে লোকের মত অপমান সহিয়া থাকা তাঁহার শোভা পায় না। অতএব তিনি চিঠিযোগে সবিশেষ বৃত্তান্ত ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে জানাইলেন।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই প্রথম প্রথম জেলার ভার পাইয়াছেন, চারি দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। তাঁর এক্তিয়ারের ভিতর নেপাল বা তদ্রূপ কোন দেশীয় রাজ্যসুলভ "জুলুম" হইয়াছে শুনিয়া, ক্রোধে তিনি দিশাহারা হইলেন। ম্যানেজারকে ডাকিয়া বিস্তর তিরস্কার করিলেন, এবং আদেশ দিলেন, "ফেল্‌ফোর" নাবালককে সদরে আনিতে হইবে।

সে সহজ কথা নহে। ম্যানেজার কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে চিনিতেন। বুঝিলেন, কিছু কল কৌশল না করিয়া সহসা এই হুকুম তামিল করিতে গেলে তিনি একটা খুনোখুনির হাঙ্গামায় পড়িবেন। কিন্তু সাহেব তাহা বুঝিলেন না। ম্যানেজারের রিপোর্ট পাইয়া তাঁহার সন্দেহ রহিল না, হয় হরপ্রিয়া অর্থবলে তাহাকে বশ করিয়াছে, নয় সে ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য এবং ভীরু। শেষে সাহেবের আদেশে পুলিস ইনস্পেক্টর সিপাহী শান্ত্রী-ঘেরা পাল্‌কীতে দীনেন্দ্রনাথকে সদরে হাজির করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, শেষে যদি সত্য সত্যই কালেক্টর সাহেব তাঁহার কোকনকে ধরিয়া লইয়া যায়, নিজে তিনি আত্মহত্যা করিয়া এ জীবনজ্বালা জুড়াইবেন, নহিলে কিসের জন্য প্রাণ? কিন্তু হিন্দুর মেয়ে মরাটা যত সহজ মনে করে, আসলে মৃত্যু কিছু ততটা সহজ নহে। স্বামীর অন্তিমক্ষণে শোকের অধীরতায় একবার তাহাই ভাবিয়া তিনি হৃদয় বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু তার পর সকল ফুরাইয়া গেলে মধুর কণ্ঠে ছেলে যখন মা বলিয়া ডাকিল, এবং কচি কচি হাত দুখানি দিয়া চারি বছরের সে অঞ্চলের নিধি তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া আধ আধ কথায় বলিল—"ছি কেঁদো না", তখন তাহার মুখ চাহিয়া আবার তাঁর বাঁচিতে সাধ হইয়াছিল। পুলিশের কৌশলে ঘটনার দিন বহির্বাটীতে ভালুক-নাচ সুরু হইলে, দীনেন্দ্রকে বাহিরে পাঠাইয়া স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকুরাণী চীলের ঘরের খড়খড়ি ঈষৎ মুক্ত করিয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ নীলপোসাক-আঁটা শ্মশ্রুগুম্ফে পরিপূর্ণ পুলিসের দারোগা মহাশয় ঘোড়া ছুটাইয়া সেখানে আসিলেন। দেখিতে দেখিতে বাহকস্কন্ধে এক খানা পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং একটা গোলমাল হইয়া উঠিতে না উঠিতে রোরুদ্যমান নাবালককে তাহাতে পূরিয়া দারোগা

সাহেব তাঁহার ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ছদ্মবেশী কনষ্টেবেলের দলকে সটান যাত্রার আদেশ দিলেন। চকিতে পাল্কী দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। পরিচারিকারা গিয়া দেখিল, পাষাণমূর্ত্তিবৎ কর্ত্রী সেই পাল্কীর পথ চাহিয়া আছেন! তখন তাঁহার মনে হইতেছিল, সেই চীলের জানালা গলিয়া লাফাইয়া পড়িলে এ অপমান এবং ক্লেশের অবসান হইতে পারে, কিন্তু পাল্কী হইতে কোকনের যে উচ্চ রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে এবং মর্ম্মে পশিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নড়িবার যো ছিল না।

ঘণ্টা দুই পরে নীচে আসিয়া কর্ত্রী ঠিক্ করিলেন, তিনিও ছেলের সঙ্গে সঙ্গে কালেক্টর সাহেবের কাছে যাইবেন, এবং দুঃখিনীর মত কোকনকে ভিক্ষা করিয়া লইবেন। বলিবেন যে, বিষয় আশয় তিনি কিছু চান না, কিন্তু তাঁর বুকচেরা ধন ছাড়িয়া তিনি বাঁচিতে পারিবেন না। প্রতিবেশী এবং আমলারা মেয়েলী বুদ্ধি বলিয়া পরামর্শটা উড়াইয়া দিলেন, এবং সকলে যুক্তি করিয়া টাকার তোড়া সঙ্গে পাল্কীর উদ্দেশে ঘোড়সওয়ার রওনা করিলেন। তাহাতে পুলিশচরিতজ্ঞ লোকমাত্রেরই ভরসা হইয়াছিল বটে যে, নাগাইদ সন্ধ্যা দারোগা সাহেব সপাল্কী ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘোড়সওয়ার রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়া এত্তালা করিল যে, টাকা পাইয়া দারোগা সাহেব ভারি খুসী হইয়াছেন, এবং কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে "বহুৎ বহুৎ সেলাম" দিয়া বলিয়াছেন যে, কোন "পরওয়া" নেই, তাঁহার পুত্রকে পরম যত্নে তিনি সাহেব

বাহাদুরের হুজুরে পৌঁছিয়া দিবেন। আর কর্ত্তার অনেক খোস নাম করিয়া রিপোর্ট করিবেন যে, নাবালককে বিনা ওজরে তিনি হাজিরি দিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি।

হরিপ্রিয়া মরিতে পারিলেন না। "মিতিন" প্রভৃতি বয়স্যার দল তাঁহাকে সহজেই বুঝাইয়া দিল যে, বিষয় যখন "কোর্টে" গিয়াছে, তখন দু দিন আগে হোক্, কি পাছে হোক্, কোকনকে কাছ-ছাড়া করিতেই হইত। এখন মিছামিছি কাঁদাকাটা করিয়া "ছাওয়ালের" অকল্যাণ করাটা ভাল নয়, বরং তার বিবাহ দিয়া বউমাকে ঘরে আনিয়া সংসার বজায় রাখিবার চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য। অতএব, সেই আশায় উৎসাহে কর্ত্রী ঠাকুরাণী আবার স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতিতে মন দিলেন। মরা হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে হরিপ্রিয়া দেবী স্বর্গারোহণ করিতে পারিলে তাঁহার কোকনের ভাল হইত, এ কথা অনেককে বলিতে শুনা গিয়াছে। ইহার যথেষ্ট কারণ ছিল। কালেক্টর ষ্টুয়ার্ট সাহেব দীনেন্দ্রনাথের লেখা পড়া এবং ক্রীড়া কৌতুকের বিশিষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বোর্ডে রিপোর্ট পাঠাইলেন। এ দিকে ভিতরে ভিতরে মাতা বিস্তর টাকা খরচ করিয়া কালে-

ক্টর-নিয়োজিত লোক জনকে বশ করিয়া ফেলিলেন, এবং তাহার ফলে কোকনের বল্যসখারা প্রায় প্রত্যহ কুণ্ডলা হইতে সদরে আনাগোনা সুরু করিল। দীনেন্দ্রের পরম প্রিয় পাখী এবং ছাগ মেষের পালও ক্রমে আসিয়া জুটিল। টাকার জোরে এ সকলের কিছুই ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কানে উঠিত না। বাসায় গিয়া "ওয়ার্ড"কে দেখিয়া আসা কোন আইনে কর্ত্তব্য কাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করে না; সুতরাং নাবালক মাঝে মাঝে দেখা করিয়া আসাতেই কালেক্টর বুঝিতে পারিতেন যে, ক্রমে সে বেশ শায়েস্তা হইতেছে। বিশেষতঃ, অশ্ববিদ্যাপারদর্শী ষ্টুয়ার্ট সাহেবের আদেশমত ম্যানেজার নাবালকের জন্য ঘোড়া কিনিয়া দেওয়ায় এবং তাহাকে দু এক দিন তাহাতে চড়িতে দেখায়, কালেক্টর নিজের হুকুম তামিলের আত্মপ্রসাদটুকু উপভোগ করিতে করিতে বদলী হইলেন। তার পরও পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে দুই এক জন কালেক্টর আসিলেন, এবং গেলেন। কাজেই দীনেন্দ্রনাথের উপর যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ষ্টুয়ার্টের ছিল, তাহার তীব্রতা এবং বাঁধাবাঁধি কমিয়া আসিল। ইংরেজ রাজ্যে যত গুলি অসম্পূর্ণতা আছে, এই দুর্ব্বোধ্য "পবলিক সার্ব্বিসের" প্রয়োজনবশতঃ যখন তখন আফিসার বদলের রেওয়াজ তার অন্যতর। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পর বছরে গড়ে দুটো করিয়া কালেক্টর বদলী হওয়ায়, দীনেন্দ্রের অধঃপাতের পথটা বেশ সুগম হইয়া উঠিল। শেষে সদাশিব, শ্রীমান্ গোবিন সাহেব আসিলেন। দীনেন্দ্র তখন সহরবাসী বড়মানুষের ছেলে সুলভ বিস্তর চালাকি

শিখিয়া ফেলিয়াছে। অতএব, সাহেবটিকে সিধা লোক পাইয়া নানা অছিলায় তাহার মাতৃদর্শন ঘটিত, এবং দু দিনের ছুটীতে মোটে দুই সপ্তাহ বাড়ীতে কাটাইয়া গেলেও কোন কথা উঠিত না। এইরূপে নাবালক চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া পঞ্চদশে পা দিল। মাতা তখন অনেক তদ্বির করাইয়া বোর্ড হইতে ছেলের বিবাহের মঞ্জুরি অনাইলেন। যথাকালে খুব ধূম ধামে দীনেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল।

এই সময়ে কলিকাতার স্বনামখ্যাত ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরলোকের পথে যাইতে বুড়ারা যেমন সকল তীর্থ শেষ করিয়া ৺ কাশীধাম সার করেন, তখনকার দিনে বড়মানুষের ছেলেরা এইখানে আসিয়া জুটিতেন। এই ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউট নাবালকির নিশীথে বিস্তর রাজা জমীদারকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদের জ্ঞানের এবং যৌবনের প্রভাতে তাহাদিগকে দেশের নানা দিকে ছাড়িয়া দিয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা দিক্ দেখাইয়া দিয়াছে। বিবাহশেষে দীনেন্দ্রকে সেখানে যাইতে হইয়াছিল।

জেলার সদরে থাকিয়া দীনেন্দ্রনাথ কয় বছরে মোটামুটি ইংরেজী বলিতে কহিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, চুরট এবং সোডা লেমনেড্ খাইতে শিখিয়াছিলেন। কোর্টঅবওয়ার্ডস্ তাঁহার নিজের খরচপত্রের মাত্রা বাঁধিয়া দিলেও, মাতার "জায়গীরের" তহবিলের উপর কাহারও হাত ছিল না; অতএব হরিপ্রিয়া-দুলাল কোমল বয়সেই বেশ "সাখরুচে" হইয়া উঠিলেন।

হরিপ্রিয়া নিজের জপ তপ আহ্নিক এবং তাঁহার কোকনের চিন্তা লইয়া থাকিতেন, কখন সোড়া লেমনেডের মর্ম্ম বুঝিতেন না। অতএব সে সবে অভ্যস্ত দীনেন্দ্র প্রথম বার বাটী গিয়া বোতল খুলিয়া সেই ম্লেচ্ছের জল মাতৃসমীপে পান করায়, তাহার বড় নিন্দা হইল, এবং কালেক্টর সাহেব তাঁহার অবোধ সন্তান ও তাহার পিতৃপুরুষের ইহকাল পরকাল নাশ করিতে বসায়, শ্রীযুক্তা হরিপ্রিয়া দেবীর কাছে অনেক গালি খাইলেন। অতএব অতঃপর বেশী টাকা কড়ির দরকার হইলে, বাড়ী আসিয়া দীনেন্দ্রনাথ মাতাকে প্রথমতঃ সোডার্ বোতল খুলিয়া এক বার রাগাইত এবং কাঁদাইত, তার পর নিতান্ত ভাল ছেলে-টীর মত সন্ধ্যা আহ্নিকে মন দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া যাইত। প্রকৃতির আইনানুসারে এই সকল গুণ ক্রমে আরো বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মফঃস্বলের "বনলতা" কি করিয়া রাজ-ধানীর "উদ্যানলতা" হইয়া যায়, পরে তাহা দেখা যাইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোবিন সাহেবের পর ডোনাল্ড সাহেব জেলার পাকা কালেক্টর হইয়া আসিলেন। দীনেন্দ্রনাথ তখন কলিকাতার ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউটে এবং তাঁহার মাতা ও পত্নী কুণ্ডলার বাটীতে। ম্যানেজার বাবুটী পরলোক গমন করায় পুরাতন নায়েব

সিদ্ধেশ্বর রায় সম্প্রতি সে পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার চেষ্টা ও তদ্বিরে কাছারী ফের কুণ্ডলায় উঠিয়া আসিয়াছিল।

অকালী সিংএর প্রত্যাগমনের পরদিন, ম্যানেজার, মোক্তার হারানন্দ তালুকদারের চিঠি পাইলেন। মোক্তার মহাশয় তাহাতে পূর্ব্বদিনের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, অদ্যই কালেক্টর সাহেব কুণ্ডলা যাত্রার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু পেশকারের সহায়তায় তিনি হাকিমের সে রায় ফিরাইয়াছেন। অতঃপর ডোনাল্ড সাহেবের কবে শুভাগমন হইবে, তালুকদারপ্রবর সে কথাটা তেমন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু কৃতোপকারের জন্য পেশকার যে পুরস্কারের যোগ্য, তাহার ইঙ্গিত করিয়া, যথাসময়ে সকল কথার এত্তালা দিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সিদ্ধেশ্বর রায় নায়েবির খোলস ছাড়িয়া অবধি নিজ নূতন পদগৌরবের উপযোগী কোন একটা কৃতিত্ব দেখাইবার দাঁও খুঁজিতেছিলেন, অতএব এই খবরটায় একটু একটু উদ্বিগ্ন হইলেও নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না।

সংসারে যাহাকে কাজের লোক বলে, মৃত ম্যানেজার ঠিক তাহা ছিলেন না। তাঁহার চরিত্রে ধর্ম্মভয় এবং চক্ষুর্লজ্জা নামক দুইটা উপসর্গ বিদ্যমান থাকায়, দাবী সত্ত্বেও তিনি ছোট তরফের বিষয়টাকে দেনার দায়ে একেবারে জাহান্নমে দিতে চাহিতেন না। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর রায় বছর দুয়েক ছোট তরফে মুহুরিগিরি করার পর বড় তরফের নায়েব হইয়াছিলেন;

ম্যানেজার হওয়ায় সহজেই ভাবিলেন, মনিব সাবালক হইয়া দেওয়ানীটে তাঁহাকেই দিবেন, অতএব নূতন নিমকের হালামি করিতে যদি পুরাতন নিমকে হারামি ঘটে, তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না। ইহার দুই একটা উত্তেজক কারণও ঘটিয়াছিল। মুহুরী সিদ্ধেশ্বর, ম্যানেজার সিদ্ধেশ্বর বাবু হইয়া আসার খবর উঠিলে অকালী সিং এক দিন আহ্লাদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যায় বটে, কিন্তু সে সেই আগেকার ধরণে কখন "আপ" এবং কখন "তোম্" বলিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। কথায় কথায় ছোট তরফের সঙ্গে পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিয়া অকালী সিং যখন বলিল যে, তাহার বিশ্বাস, প্রভুকন্যার তিনি সর্ব্বনাশ হইতে দিবেন না, সিদ্ধেশ্বর রায় তখন রাগে গর গর করিতেছিলেন।

কাজেই নূতন ম্যানেজারের আমল পড়িতে না পড়িতে ছোট তরফের প্রজারা শুনিল, অতঃপর তাহাদিগকে বড় তরফে খাজনা দিতে হইবে। মফঃস্বলের আমলা পাইক নগদীরা পর্য্যন্ত ক্রমে বড় তরফের টান টানিতে লাগিল। অকালী সিং মহালে গিয়া আর বড় আমল পায় না। সর্ব্বস্ব যায় দেখিয়া সে বুদ্ধি খরচ করিয়া, কালেক্টর সাহেবের শরণ লইয়াছিল।

অতিবুদ্ধিবলে সিদ্ধেশ্বর বুঝিলেন, কালেক্টর সাহেব দেখিতে আসিতেছেন যে, ছোটতরফের অধিকারিণী নাবালিকা কি না? তাহাকে এখন সাবালিকা প্রমাণ করাইতে পারিলেই বড়

তরফের ডিক্রীতে বিষয়গুলা সত্তঃ সত্তঃ নীলামে উঠিবে। অতএব রায় মহাশয় তাহার তদ্বীরে ব্রতী হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধেশ্বর রায় কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হুজুরে হাজিরি দিলেন। বিষয় আশয় সংক্রান্ত সলা পরামর্শের কথা উঠিলে, হরিপ্রিয়ার মাথায় যেন বজ্রপাত হইত, কিন্তু কৌশলী সিদ্ধেশ্বর রায় কোন না কোন অছিলায় মাঝে মাঝে তাঁহাকে দরবারে বসিতে অভ্যস্ত করিতেছিলেন। অন্যান্য সময়ে বারবেলা এবং শারীরিক অসুস্থতার ভান করিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী পাঁচ দিনের সাধ্য সাধনার কম রায়জির হাজিরি গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু এবারে অনুরুদ্ধ হইয়া বিনোদা দাসী তাঁহাকে জানাইয়া দিল, অতিশয় জরুরি এবং গোপনীয় পরামর্শ আছে, না শুনিলে কোকন বাবুর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অগত্যা কর্ত্রী ঠাকুরাণী দরবারে বসিতে সম্মত হইলেন—পর্দ্দার আড়ালে বিনোদা দাসী তাঁর কাছে রহিল। বাহিরের লোকের ভিতর কেবল বিশ্বস্ত খানসামা হরা, ম্যানেজার বাবুর সম্মুখে থাকিতে পাইল। পর্দ্দামধ্যবর্ত্তিনী কর্ত্রী, দাসী বিনোদের জবানী যাহা বলাইতেছিলেন "মা বুল্‌তিছেন" ইতি ভূমিকা করিয়া সে তাহাই উক্ত করিতেছিল। তাহার কথায় কোন অস্পষ্টতা না থাকিলেও,

অভ্যাসবশতঃ হরা খানসামা মুৎসুদ্দিআনা করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে টীকা টিপ্পনী করিতেছিল। ইহাতে ম্যানেজার মহাশয়ের বিরক্তির কারণ হইলেও, তিনি ঘাড় নাড়িয়া হরার কথায় সায় দিতেছিলেন।

রায় মহাশয় কর্ত্রীর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; ভরসা, মনিব স্বচক্ষে দেখিয়া খুসী হইলে, ভবিষ্যতে ইষ্টেটের দেওয়ানী তাঁরই হইতে পারে। কিন্তু পর্দ্দার কাপড়টা কিছু অতিরিক্ত মোটা বলিয়া কর্ত্রী তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না; হরাও প্রণাম জানাইল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষণ যোগ করিল না। বিনোদা বলিল, "মা পুছ্‌তিছেন, রায়জীর শরীর ত ভাল আছে?"

"ভালই আছে" বলিয়া সিদ্ধেশ্বর একেবারে কাজের কথায় গিয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কেন না, তাঁহার জানা ছিল, অতঃপর কর্ত্রী তাঁর পুত্রকলত্রাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, গঙ্গাস্নান কি ব্রাহ্মণভোজনের প্রসঙ্গ তুলিলে, কাজের কথা চাপা পড়িয়া যাইবে। রায় মহাশয় তাই এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন যে, শরীর তাঁর ভালই আছে বটে, কিন্তু মনটা ভাল নাই। এবং তার পর কর্ত্রীর প্রশ্নমতে মোক্তারের চিঠির মর্ম্ম বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া কর্ত্রী কিন্তু রায়মহাশয়ের মত বৈষয়িক উৎকণ্ঠায় নিমগ্ন হইলেন না। শরিক ছোট তরফের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কালেক্টর সাহেবের আদেশে যে দিন তাঁর

কোকনকে দারোগা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, সে দিন মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, "মৈত্র গোষ্ঠীর যা কিছু ইজ্জৎ আবরু ছিল, তা আর থাকে না দেখ্‌চি। কোকনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে যা হোক্ ব্যাটাছেলে, তাতে ইজ্জতের উপর হাত পড়েনি। ছোট তরফের কুকিকে যদি নিয়ে যায়, তবে কি সর্ব্বনাশ হবে? তার না হয় মা বাপ নেই, কিন্তু আমরা ত এখনও বেঁচে আছি। রায়জী, টাকা খরচ কর্‌লে কি কালেক্টর সাহেবকে নিরস্ত করা যায় না?"

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর হাল্‌কা বুদ্ধিতে রায়জীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কিন্তু একে মনিব, তায় কৌশল করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। কাজেই মনের সে ভাব গোপন করিয়া উর্ণনাভের মত তিনি জালবিস্তারে মন দিলেন।

"হুজুরের দয়া মায়ার শরীর, সকলের মান ইজ্জতের দিকেই দৃষ্টি। কিন্তু ছোট তরফের বাবু এ তরফকে একচোটে পেলে দুচোটের অপেক্ষা রাখ্‌তেন না। আমি তখন ও তরফে কাজ করি, আমার আর কিছু জান্‌তে বাকী নেই। তা, কালেক্টর সাহেব যা ইচ্ছে করুক, তাতে আমাদের কি বয়ে গেল? তবে এই সুযোগে আমি ভাবচি কি যে, ছোটতরফের বিষয়গুলো কোকন বাবুর ক'রে দিই। মাঠাকুরাণীর এতে কি মত?"

বিষয় আশয়ের কথা শুনিয়া কিন্তু মাঠাকুরাণীর মাথা ঘুরিতেছিল, বিশেষ এ প্রহেলিকার ছন্দাংশ তাঁহার বোধগম্য

হয় নাই। ম্যানেজার আপন প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া দুই বার তাহা পুনরুক্ত করিলেন। কাজেই কলের পুত্তলীর মত কর্ত্রী বলিলেন, "যা ভাল বিবেচনা হয়, করুন।"

সাহস পাইয়া রায়জী বলিয়া বসিলেন, "কালেক্টর সাহেব আসবেন তদারক করতে যে, ছোটতরফের কুকি—নাবালিকা কি সাবালিকা? নাবালিকা প্রমাণ হলে বিষয় কোর্ট-অব্ ওয়ার্ডে যাবে, তা হলে পাঁচ সাত বছরের ভেতর ডিক্রীর দেনা সব শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে, তিনি সাবালিকা, ষোল বছরের কম বয়স নয়, তা হলে কালেক্টর সাহেব বিষয় আশয়ে হাত দেবেন না, দেনার দায়ে অনায়াসে আমরা সর্ব্বস্ব বেচে নিতে পারবো।"

এতক্ষণে হরিপ্রিয়া ম্যানেজারের কথা বুঝিলেন, এবং আতঙ্কে জিহ্বা দংশন করিলেন। বিনোদা তাহা দেখিয়া আপনা হইতে বলিল, "সে চেষ্টা পাওয়া হবে না রায়জী!"

সিদ্ধেশ্বর। কেন?

কর্ত্রীর শিক্ষামতে বিনোদা বলিল, "মা বুল্‌তিছেন, পরের মন্দ করতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। আমার কোকনের যা আছে, তাই খায় কে? অধর্ম্ম ক'রে বিষয় করলে কি ভোগ হয় রায়জী? আজও ত চন্দ্র সূর্য্য উঠচে—সত্যিই কিছু ঘোরকলি এখনও আসে নি।"

সিদ্ধেশ্বর রায় এ কথার উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিলেন, "ছোট তরফের বিষয়টুকু যদি হাত করতে পারি, বছর

দশেকের ভিতর লক্ষ টাকার মুনফা হবে, সে আর কি আশ্চর্য্য কথা! কিন্তু সে সবই নির্ভর কর্‌চে কর্ত্তামা'র একটা কথার উপর। কালেক্টর সাহেব জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে বল্‌তে হবে যে, কুকীর বয়স ষোল বছরের কম কিছুতে নয়। আর তাতে কোকন বাবুর বয়সও কিছু বেড়ে যাবে। এখনও তাঁর সাবালক হতে প্রায় পাঁচ বছর বাকী। এ হিসাবে খুব কম হয় ত তিনটে বছর এগিয়ে আস্‌বে।"

হরিপ্রিয়া। তা আমি কখন বল্‌তে পার্‌বো না। আমার একটী ছাওয়াল, আর জন্মে কত পাপ করেছি, তাই এত শাস্তি। তামা তুলসী নিয়ে মিছে বলে কোকার অকল্যাণ কর্‌ব?

বিনোদা বলিল, "মা তামা তুলসী তোমার হাতে দেয় ত আমি জানালা গলিয়ে ফেলে দেব। সে ভয় করো না!"

হরা বলিল, "সত্যি সত্যি কিছু কালেক্টর সাহেব কর্ত্তা মা'কে তামা তুলসী দিয়ে জিজ্ঞেস করবে না। তাও কি হয়? মা হলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, "বিষয় আশয় কর্‌তে গেলে কল কৌশল ছাড়া গতি নেই। তামা তুলসী! হলেই বা! রূপো সোণা বেশী কি তামা বেশী! তার পর টাকা খরচ করে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লেই ত পাপক্ষয় হয়!"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী কিছুতে মিছা বলিতে সম্মত হইলেন না। "আমার ছাওয়ালের অকল্যাণ হবে", বার বার এই কথাই বলিলেন।

কাজেই সিদ্ধেশ্বর পরামর্শ করিলেন, কালেক্টর সাহেব আসিলে শরীর ভাল নয় বলিয়া কর্ত্রী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। রায়জী উঠিবার সময় বিনোদা ও হরাকে সাবধান করিয়া দিলেন, কথাটা যেন প্রকাশ না হয়; কিন্তু বিনোদা দাসী যতক্ষণ না স্নানের ঘাটে ভগীর দেখা পাইয়া তাহার কানে কানে সকল কথা বলিয়াছিল, ততক্ষণ তার প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভগী দাসী কখনও কাহারও কথায় থাকে না। কিন্তু বিনোদা তার দূরসম্পর্কের মাস্তুতো বোন, সে দুটো একটা কথা মাঝে মাঝে তাহাকে না শুনাইয়া ছাড়িত না। অন্য কোন কথা শুনিলে ভগী হয় তখনই ভুলিয়া যাইত, নয় পরিপাক করিয়া ফেলিত, কিন্তু সুরবালার অমঙ্গলসূচক অমন একটা খবর জমাদারকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত কথায় না শুনাইয়া সে থাকিতে পারিল না। শুনিয়া অকালী সিং অনেকক্ষণ অগ্নিগর্ভ ভূধরের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। দুনিয়াতে নেমকহারামির ততটা প্রাবল্য হওয়ায়, সে দিন প্রাতঃকালে অকালী সিং সুর করিয়া রামায়ণ পড়ার নিত্যকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিল, এবং বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গালি না দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহার আরক্ত চক্ষু এবং কম্পিত গুম্ফ

হইতে গৈরিকনিস্রববৎ যে সকল তপ্ত বাক্যবাণ নির্গত হইল, বাঙ্গালী শ্রোতারা তাহার ভিতর "শ্যালা" ও "শ্বশুরা" ছাড়া আর বড় কিছু বুঝিতে পারিল না। সুরবালা তখন অনন্যমনে দোতালার ঘরে বসিয়া পুতুলগুলিকে কাপড় পরাইতেছিল। অকস্মাৎ জমাদারের উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া দেউড়ীর দিকে যখন ছুটিয়া গেল, অকালী সিং তখন তাহার সেদিনকার অব্যক্তনামা শ্যালক বা শ্বশুরকে নাগরাপেটা করিয়া দুরস্ত করিয়া দিবে, এইরূপ "কসম" লইতেছিল। কিন্তু সুরোদিদিকে দেখিবামাত্র তাহার সব রাগ জল হইয়া গেল। সুরবালা বিস্ফারিতনেত্রে ভয়ে কৌতূহলে যখন জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে অত গাল দিচ্ছ জমাদার?" জমাদার তখন হাসিয়া বলিল,—"দুনিয়ামে বড়া সব নেমকহারাম আছে দিদি!"

কিন্তু স্নানান্তে খড়ম পায়ে দিয়া দীর্ঘশিখা ঝাড়িতে ঝাড়িতে অকালী সিং যখন "চৌকীর" দিকে যাইতেছিল, তখন অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, অত রাগ না করিয়া ম্যানেজার বাবুকে নিজে গিয়া দুটো মিষ্টকথা বলিয়া আসিলে ক্ষতি কি? সত্য সত্যই কি সংসার এত স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে যে, লোকে নিমকের খাতির একেবারে ভুলিয়া যাইবে? অতএব "রোটী বানাইতে বানাইতে" অকালী সিং মনঃস্থির করিল, রাত্রে সিদ্ধেশ্বর রায়ের বাসায় গিয়া গোপনে তাঁহার সহিত মোলাকাৎ করিবে।

এদিকে রায়জী কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে বাগাইতে না পারিয়া সাক্ষীর যোগাড় দেখিতেছিলেন, এবং জনকতক পেশাদার সাক্ষীকে শিখাইতে পড়াইতে সেদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাছারীর মন্ত্রণাগৃহে থাকিতে হইয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, ছোট তরফের জমাদার অকালী সিং তাঁহার অপেক্ষায় তাঁহার বৈঠকখানায় দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া একটা ছোট্ট রকমের সেলাম করিল বটে, কিন্তু এমন সেলাম তিনি ছোটতরফে থাকার সময়ও করিত। তাঁহার পদবৃদ্ধির অনুপাতে সেলামও যে দীর্ঘতায় বাড়িতে বাধ্য, অকালী সিংহের মোটা বুদ্ধিতে ইহা প্রতিভাত না হওয়ায়, রায় মহাশয় আজ তাহা ফিরাইয়া দিলেন না, এবং নিজে শয্যায় উপবেশন করিয়া তাকিয়া হেলান দিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে অকালী সিং ছাড়া গৃহস্থিত আর সকল জিনিসের প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন। অকালী সিং ইহাতে প্রথমতঃ ভাবিল যে, রায়জী বুঝি তাহাকে দেখিতে পান নাই, আর অত রাত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া অন্যমনস্ক হওয়াও মানুষের পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে। অতএব পূর্ব্ব আনুগত্য স্মরণ করিয়া অকালী সিং বাবুর বিছানার দিকে ঘেঁসিয়া বসিল।

বাবু ইহাতে মহা গরম হইয়া উঠিলেন। অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "তুমি ত দেখ্‌চি বড় বেয়াদব হে?"

অকালী সীং বুঝিল, সে মুহুরী সিদ্ধেশ্বর আর নাই। হাসিয়া বলিল "বাবু! আমি গঁওয়ার, লেখা পড়া জানিনে; বেয়াদবি ক'রে থাকি, মাফ করবেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার আসা। এ কথা কি সত্য যে, আপনি ছোট তরফের নিমক ভুলে তার অনিষ্ট চেষ্টা করচেন?"

সিদ্ধেশ্বর রায় এবার একটু দমিলেন বটে, কিন্তু ধমক চমক করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার ভরসায় বলিলেন, "এমন বড় কথা বরকন্দাজের সঙ্গে হতে পারে না।"

অকালী সিং হাসিল। "বাবু, মনে পড়ে কি দশ বছর আগে এই বরকন্দাজ কোসিস্ না করলে আপনার চাকরী থাকা ভার হতো? মনিব গোসা ক'রে আপনাকে জবাব দিলে এই বরকন্দাজ অকালী সিং আপনাকে রক্ষা করেছিল!"

এ অপমান ম্যানেজার বাবুর অসহনীয় হইয়া উঠিল। "কোই হ্যায়রে" বলিয়া তিনি একটা হাঁক দিলেন বটে, কিন্তু তত রাত্রে পেয়াদারা কেহ হাজির ছিল না। খানসামা তামাক সাজিতে গিয়াছিল। অপমানের তীব্র জ্বালায় অধীর হইয়া সিদ্ধেশ্বর রায় নিজের জুতা কুড়াইয়া লইয়া অকালী সিংহের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন অকালী সিং সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল এবং "নেমকহারামির ফলভোগ কর" বলিয়া, রায় মহাশয়ের ক্ষুদ্র দেহটিকে অবলীলাক্রমে বৈঠকখানার অপর দিকে ছুড়িয়া ফেলিল।

অকালী সিং শূন্যহস্তে গিয়াছিল, লাঠিখানাও সঙ্গে লয়

নাই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আর কেহ অগ্রসর হইল না দেখিয়া, ধীরে ধীরে দেউড়ীতে ফিরিয়া চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধীরে ধীরে অকালী সিং দেউড়ীতে ফিরিয়া চলিল। যে ক্রোধাবেগে অধীর হইয়া মত্তকরীর মত সে সিদ্ধেশ্বর রায়কে অবহেলায় ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাহা যেমন তীব্র, তেমনি ক্ষণিক। আকস্মিক উন্মাদ-অধিকৃত হইয়া মানুষ যখন জীবনের সমস্ত দায়িত্ব বিস্মৃত হয়, তখন তাহার সেই অবস্থা। কিন্তু অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে না করিতে চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা অবসাদ আসিয়া ক্রমে তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। নিজের জন্য অকালী সিং কখন ভাবিত না; তখনও ভাবিতেছিল না। কিন্তু রাগ পড়িয়া গেলেই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, হয় ত ঝোঁকের মাথায় একটী কাজ করিয়া ফেলিয়া সে প্রভু-কন্যার সর্ব্বনাশ করিল। অকালী সিং বুঝিল যে, যে জোরে সে সিদ্ধেশ্বরকে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রাণ-বিয়োগ না হইলেও গুরুতর আহত হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই উপলক্ষে মামলা মোকদ্দমা বাধিয়া উঠা অনিবার্য্য। সর্ব্বস্বান্ত ছোট তরফের এমন বল নাই যে, যেরূপ একটা সঙ্গীন বিপদ সামলাইয়া উঠে। অকালী সিং এক একবার মনকে

প্রবোধ দিল বটে যে, না হয় খুন কি জখমের দায়ে সে নিজে আপদে পড়িবে, তার সুরোদিদির কোন অলক্ষণ না হইলেই হইল। কিন্তু তখনি আবার মনে হইতেছিল, তার অবর্ত্তমানে কে সেই সরলা বালিকার হিতাকাঙ্ক্ষা করিবে। অন্তিম শয্যায় প্রভুর কাছে অকালী সিং যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহার প্রাণ থাকিতে সুরোদিদিকে সে কখন ছাড়িয়া যাইবে না, হায়!' তাহা বুঝি আর রক্ষা হয় না।

মনের এই অবস্থায় অকালী সিং ক্রমে প্রভুগৃহের সমীপবর্ত্তী হইল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, কৃষ্ণদ্বাদশীর স্চীভেদ্য অন্ধকারে পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজি ক্বচিৎ বায়ুহিল্লোলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগের মত স্বনিয়া স্বনিয়া উঠিতেছে, ক্বচিৎ কালপেচক বিকট কণ্ঠে দিকে দিকে ধ্বনি জাগ্রত করিতেছে, কোথাও সশঙ্ক কুক্কুর সহসা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এই স্থান এবং কালে স্পষ্টতঃ অকালী সিং মানুষের পদশব্দ শুনিতে পাইল। কিন্তু পশ্চাতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। অকালী সিংএর দেউড়ী প্রবেশের কিছু পরে, কেহ আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল।

অকালী সিং আহার না করিয়াই বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া অবসন্ন মনে একেবারে খাটিয়া আশ্রয় করিল; শয়নের জন্য নহে, চিন্তার জন্য। একবার ভাবিল, ভগীদাসীকে উঠাইয়া সকল কথা বলিয়া একটা পরামর্শ করিবে। কিন্তু

একে স্ত্রীজাতির বুদ্ধিশুদ্ধির উপর তাহার কোন কালে তেমন বিশ্বাস ছিল না, তাহাতে ভগী আর কিছু করিতে না পারুক, কাঁদিয়া কাটিয়া সুরবালার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পাছে একটা কাণ্ড করিয়া বসে, ইহা ভাবিয়া অকালী সিং সে কথাটা মনে স্থান দিল না। এমন সময়ে কেহ দ্বারে করাঘাতের উপর করাঘাত করিল।

রুক্ষস্বরে অকালী সিং হাঁকিল, "কোন্ হ্যায় ?" আগন্তুক ঠিক সেই স্বরে বরঞ্চ সুর একটু চড়াইয়া দিয়া সেই কথাটাই পুনরুক্ত করিল। বলিল, "দুয়োরটা একবার খুলেই দেখ না বাপু! একে কোম্পানির কাজে রাত বিরেত নেই, তার ওপর যদি লোকের দুয়োরে চার দণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'কোন হ্যায়' আর 'হাম হ্যায়' করে রাত কাটাতে হয়, তবে আর জান্ বাঁচে না। খোল বল্‌চি দরওয়াজা!"

অকালী সিং বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, "ফাজিল কথা রেখে দাও। কে তুমি ?"

লোকটা পথশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল, কোম্পানির নাম লওয়া সত্ত্বেও বরকন্দাজ দুয়ার খুলিয়া না দেওয়ায়, সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল, "আমি কালেক্টর সাহেবের চাপরাসী খোদা খাঁ। সাহেবের হুকুম মতে ছোট তরফে খবর দিতে এসেচি যে, কাল বেলা নটার সময় হুজুর এখানে পৌঁছিবেন।"

কাজেই অকালী সিং দরজা খুলিল। তারপর, চাপরা-

সীকে বসাইয়া এবং তাহাকে তামাক চকমকী কলিকা দিয়া, তাহার আহারাদির ব্যবস্থা জন্য ভগীদাসীকে উঠাইতে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অকালী সিং যথাসম্ভব অনুচ্চস্বরে ভগীকে ডাকিলেও, ভগীর সঙ্গে সঙ্গে সুরোবালারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবং ভগী প্রদীপ হস্তে নীচে আসিলে, সেও সুতরাং নামিয়া আসিল। উভয়ে একটু একটু উদ্বিগ্ন হইয়াই আসিয়াছিল—কেন না, এত রাত্রে জমাদার কখন তাহাদিগকে ডাকিয়া উঠায় না। দুর্ভাবনায় অকালী সিংয়ের সৌম্যমূর্ত্তি দণ্ড দুই তিনের ভিতরেই কেমন শুষ্ক বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটী হইতে একটা শূন্য বিষাদের ভাব প্রতিভাত হইতেছিল। প্রদীপের আলোক অকালীর মুখে চোখে পড়িবামাত্র ভগী ও সুরবালা যুগপৎ চমকিয়া উঠিল।

"কি হয়েচে জমাদার, কি হয়েচে জমাদার" বলিয়া সুরো আদরে অকালী সিংহের কাঁধ দুটিতে তাহার কচি কচি হাত দুখানি রাখিল। তাহাতে একটা অনির্ব্বচনীয় অপত্যস্নেহ স্পর্শতুল্য বিমল সুখ অনুভব করিয়া অকালী সিং আপনার উদ্বেলিত হৃদয়ভাব গোপন করিতে গিয়া দুই ফোঁটা চোকের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিল না। আপনার বস্ত্রাঞ্চলে

তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সুরবালা কাতর কণ্ঠে বলিল, "জমাদার, তুমিও বুঝি আমার মতন স্বপন দেখেছ? তা স্বপনে আপনার মন্দ দেখ্‌লে পরের মন্দ হয়—নয় ভগী বেটী? আমিও একটা ভারি ভয়ের স্বপন এই মাত্তর দেখ্‌ছিলাম জমাদার। কে যেন তোমায় আমাদের দেউড়ী থেকে চুরী কর্‌তে এয়েচে। তুমি বল্‌লে, দিদি হুকুম দাও, ওর মাথা কেটে আনি। এমন সময় তুমি ডাক্‌লে, আর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

অকালী সিং দেখিল, এই স্বপ্ন নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। দেবী বুঝি এই স্বপ্নচ্ছলে সরলা বালিকার কোমল হৃদয় আগে হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। স্থিরকণ্ঠে অকালী বলিল, "দিদি, আমিও স্বপ্নে দেখেছি, তোমার দেউড়ী থেকে আমায় ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি আবার ফিরে আসব!"

ভগী বলিল, "জমাদার, আজ দেড় কুড়ি বছর এই মনিব-বাড়ীতে এক সঙ্গে আছি, তোমার চেহারা কখন এত খারাপ দেখিনি! সত্যিই কি তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে? এই বৃহৎ পুরীতে একা সুরোকে নিয়ে কি করে কাটবে?" ভগী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

অকালী সিং দেখিল, যাহা সে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই হইতে বসিয়াছে। অতএব মুখ বিকৃত করিয়া ভগীকে ভ্যাঙ্গাইয়া সে সুরো দিদিকে হাসাইয়া দিল এবং বলিল যে, সুরো দিদি ও সে দুই ভাই বোনে ছেলেমানুষ, স্বপন দেখে

তারা কাঁদচে বলে "বুড়্‌টি" ভগীর কাঁদবার কি এক্তিয়ার। কাজেই ভগী বিপদের কোন কথা তখন বুঝিতে পারিল না। সুরবালাও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেল।

কালেক্টর সাহেবের চাপ্‌রাসী অতঃপর পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া শয়ন করিল। অকালী সিং সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চক্ষু বুজিতে পারে নাই। সে দিনকার ঘটনা-পরম্পরার আলোচনা করিয়া সে স্থির বুঝিয়াছিল, রজনী-প্রভাতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুকন্যার অদৃষ্ট পরীক্ষিত হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অকালী সিং মোকদ্দমা মামলার কিছু কিছু বুঝিত। ইংরেজ রাজত্বে বিচার যে ধনসম্পত্তিগত, এবং সকল তাতেই "সাবুদের" জয়, ইহা সে বড় এবং ছোট তরফের বিস্তর মোকদ্দমায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিল। অতএব, তাহার অবর্ত্তমানে সুরো দিদির কি দশা হইবে, ভাবিতে গিয়া এক একবার যখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, আশা তখন দুষ্টসরস্বতীর মত তাহার কানে কানে বলিতেছিল, "ভয় কি, তুমি যে নেমকহারামটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছ, তার সাক্ষী কে?" ইহাতে প্রথম প্রথম একটু আশ্বস্ত হইলেও, অকালী সিংএর ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগিতেছিল। আত্মরক্ষার জন্য আদৌ তাহার ভাবনা হয় নাই। কিন্তু প্রভুর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে সেই

যে আজীবনের প্রতিশ্রুতি, তার সঙ্গে বীরধর্ম্মের কর্ত্তব্যজ্ঞানকে অনেকক্ষণ যুঝিতে হইয়াছিল। "প্রাণ থাকিতে সুরোকে কি করিয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া যাইব? প্রভু প্রমথনাথ স্বর্গে বসিয়া কি আমার নেমকহারামি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন না!" এই চিন্তা অকালীসিংকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু এ দিকে প্রমাণ নাই বলিয়াই কি সে কাপুরুষের মত মিথ্যা ছলনায় জীবনভার বহন করিবে? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, অকালী সিং সিদ্ধেশ্বর রায়ের এ দশা কে করিল জান, তখন কি অকালী যে সে মানুষের মত আপনার কৃত কার্য্য অস্বীকার করিয়া বসিবে? ধিক্! অকালী সিং হইতে তাহা হইবে না। অতএব কৃতজ্ঞতায় এবং বীরধর্ম্মে প্রায় সমস্ত রাত্রি যে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল, প্রভাত হইতে না হইতে তাহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া, জমাদার অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লহৃদয়ে শয্যা ত্যাগ করিল।

কালেক্টর সাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অকালী সিং যথাসাধ্য উদ্যোগ আয়োজন করিল। প্রমথনাথ বিস্তর ব্যয়ে এবং পরম যত্নে আপনার বৈঠকখানা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার সে পূর্ব্ব সৌষ্ঠব না থাকিলেও অকালী সিংহের যত্নে কিছুই তেমন বিকৃত হইতে পায় নাই। স্বহস্তে অকালী রোজ প্রাতে আস্‌বাবগুলির ধূলি মার্জ্জিত করিয়া দিত, প্রভু যেখানে যাহা রাখিতেন, তাহার কোন অন্যথা হইতে দিত না—প্রাতে সন্ধ্যায় প্রভুর তৈলচিত্রের

প্রতিমূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে সজলনেত্রে উদ্দেশে তাঁহাকে নমস্কার করিত। অনেক দিনের পর তাহার সেই দেবমন্দিরের সমস্ত দ্বার জানালা খুলিতে খুলিতে অকালী সিং মথিত হৃদয়ে বারংবার অশ্রুত্যাগ করিল। তার পর সম্মুখস্থ অযত্নরক্ষিত উদ্যানে কালেক্টর সাহেবের আহারাদির জন্য একটা পুরাতন অসংস্কৃত তাঁবু খাড়া করাইয়া দিল। নিজের নিত্যকর্ম্মগুলি শেষ করিয়া তাহার জমাদার যখন অনেক দিনের রাঙ্গা পোষাক এবং জরি-দেওয়া পাগড়ি মাথায় দিয়া দেউড়ীতে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল, সুরবালাকে ভগী তখন স্নান করাইতেছিল। কিন্তু সে খবর পাইবামাত্র সুরো ভিজে মাথায় ভিজে কাপড়ে দৌড়িয়া আসিয়া অকালী সিংকে দেখিতে দেখিতে হাসিয়া আকুল হইল। অন্য সময়ে অকালী এই হাস্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, আজ তাহার চক্ষে জল আসিল।

বড় তরফেও কালেক্টর সাহেবের আগমনবার্ত্তা পৌঁছিয়াছে। ম্যানেজার গুরুতর আহত হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। ভূতে তাঁহার সে দশা করিয়াছে প্রচার হওয়ায়, মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেছে। কর্ত্রী ঠাকুরাণী শুনিয়া বলিলেন, "দেখ্লে, পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। ভাগ্যিস্ আমি মিছে বল্‌তে রাজি হইনি!" কালেক্টর হঠাৎ আসিতেছেন শুনিয়া হরিপ্রিয়া সশঙ্কিতা হইয়া উঠিলেন। পথে তাঁহাকে ম্যানেজারের অভাবনীয় অবস্থার খবর দিবার জন্য ঘোড়সওয়ার রওনা হইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ।

নয়টা বাজিয়া মিনিট পনের হইতে না হইতে সস্ত্রীক কালেক্টর সাহেব বগী হাঁকাইয়া কুণ্ডলায় প্রবেশ করিলেন। পুলিশের উপর কোন হুকুম জারি না হইয়া থাকিলেও, দারোগা সাহেবের সরফরাজিতে মাজিষ্টর কালেক্টরের অভ্যর্থনার জন্য লাল-পাগড়ী কনষ্টেবল এবং নীল-পাগড়ী লাঠি হাতে চৌকীদারের দল গ্রামের প্রবেশপথে দু'ধারে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

অতএব সাহেব বাহাদুরের শ্রীমুখ-পঙ্কজ হইতে ছোট তরফের নাম ধ্বনিত হইবামাত্র দুই জন চৌকীদার উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া শ্রান্ত ক্লান্ত অশ্বটাকে পথ দেখাইয়া চলিল। দারোগাজী তখন বড় তরফের ম্যানেজারের মোকদ্দমা লইয়া বড়ই বিব্রত ছিলেন, এবং নিজে ভূতের প্রতি আস্থাবান হইলেও, মাজিষ্টর সাহেবের ভয়ে রাত্রের ঘটনাটা এক দল অসন্তুষ্ট প্রজার উপর ফেলিবার আয়োজন করিতেছিলেন। এ দিকে আসল ঘোড়ার চেয়ে মানুষ ঘোড়ার দৌড় শক্তি কম নহে, এই নূতন তথ্য প্রত্যক্ষ করিয়া মেমসাহেব হাসিয়া অস্থির হইলেন। স্বয়ং সাহেবেরও শ্বেতচূরট অধরোষ্ঠে আনন্দরাগ দেখা দিতেছিল।

এদিকে অকালী সিং প্রভুকন্যা সুরবালার ইজ্জৎ আবরু

রক্ষার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছিল, এবং যাহাতে বালিকা কালেক্টর সাহেবের সামনে বাহির না হয়, সে জন্য ভগীদাসীকে বারংবার সাবধান করিতেছিল। কিন্তু সুরবালা বাপের এক-মাত্র আদরের মেয়ে, এবং তাহার জমাদারের পূজনীয়া ও সোহাগের সুরোদিদি, সে কোন বিধি নিষেধের ধার ধারে না। বিশেষতঃ, পিতা প্রমথনাথ সাহেবি মেজাজের লোক ছিলেন। সাহেব মেমের রাঙ্গা মুখ দেখিলে, সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েদের যেমন জুজুর ভয় জাগিয়া উঠে, কন্যাকে তিনি তেমন শিক্ষা দেন নাই। বাপের সঙ্গে সুরো অনেকবার সাহেববাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে, এবং সাহেব দম্পতির স্নেহ ও আদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। কাজেই আজ বাড়ীতে শ্বেতমুখ অতিথির আগমন হইবে শুনিয়া, তাহার আহ্লাদের সীমা ছিল না। চুল না বাঁধিলে মেম সাহেব দেখিয়া নিন্দা করিবেন বলিয়া ভগীদাসী তাহাকে স্থির হইয়া বসাইতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু সিঁথি কাটিয়া সেই অসংযমিত চূর্ণ-কুন্তলদামে দুইবার চিরুণি টানিতে না টানিতে বহির্দ্বারে গাড়ীর ঘর্ঘর শোনা গেল। ভগী তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উদ্যম করিবার পূর্ব্বেই, সুরবালা তিন লাফে অন্দরমহল ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। অতএব অকালী সিং সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া যাইতে না যাইতে সুরো আসিয়া চিরপরিচিতের মত মেমসাহেবের হাত ধরিল। সে মহিমাময়ী সরলা বালিকা মূর্ত্তি দেখিয়া মিসেস্ ডোনাল্ডও আশ্চর্য্য

হইলেন—বলিলেন, charming! কালেক্টরও ফিরিয়া চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কেবল অকালী সিংহের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ডোনাল্ড সাহেব অকালী সিংহের অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করিলেন! হাসিয়া বলিলেন, "ইনিই বোধ করি তোমার প্রভুকন্যা। বিবাহ হইয়াছে?"

ভারি সপ্রতিভ হইলেও, সুরবালা বিবাহের নামে অবনতমুখী হইল। লজ্জায় তাহার ক্ষুদ্র গণ্ড দুটা লাল হইয়া উঠিল। সাহেব দম্পতি তাহাতে নূতন শোভা দেখিলেন, এবং দুজনে আনন্দদৃষ্টি বিনিময় করিলেন!

অকালী সিং তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। ক্ষুব্ধ স্বরে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত কথায় বলিল, "না, বিবাহ হয় নাই। আর হইবার উপায়ও নাই। যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছিল, তিনি মারা গেছেন।"

ডোনাল্ড ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "Nonsense! সে দিন একজন শিক্ষিত জমিদারের সঙ্গে আমার ঠিক এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়েছিল। একেই না বলে অন্যপূর্ব্বা! পশ্চিম বাঙ্গালার লোকে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করে তুল্লে, আর

পদ্মার এ পারে আজও এত কুসংস্কার! এর অর্থ এই যে, এ প্রদেশে শিক্ষা এখনও তেমন বিস্তৃত হয়নি। আচ্ছা, এই বালিকা প্রথমে কোর্টঅবওয়ার্ডসের অধীনে লেখা পড়া শিখুক, তার পর দেখা যাবে, কে ইহার বিবাহ রোধ করে!"

ডোনাল্ড সাহেব "জনবুলোচিত" অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় এদেশীয় সমাজনীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া সহধর্ম্মিণীর প্রশংসা-মান উদার দৃষ্টি টুকু অর্জ্জন করিলেন বটে,কিন্তু কথাটা অকালী সিং বা সুরবালা, কাহারও ভাল লাগিল না। অকালী বুঝিল, এখন সাহেবের কথায় প্রতিবাদ করিলে কার্য্যোদ্ধারের বিঘ্ন হইতে পারে। কথাটা যেমন তেমন হইলে সে কিছুই বলিত না, কিন্তু যাহাতে তাহার প্রভুগৃহের "খানদানের" উপর হাত পড়ে, এমন কোন প্রস্তাব "তাঁবেদার"বৎ নীরবে শুনিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। যথোচিত বিনীতভাবে মৃত প্রভুর তৈলচিত্রখানির প্রতি সজল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অকালী সিং বলিল, "জনাব আলি, একমাত্র কন্যাকে বিবাহ দিয়া সুখী হইবেন, প্রভুর আমার এই বড় আশা ছিল। যে দিন বাক্‌দত্ত পাত্রের মৃত্যু খবর আসিল, আমায় ডাকিয়া বলিলেন,অকালী, আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না। সুরোর আবার বিয়ে দিলে সে হয় ত সুখী হবে, কিন্তু আমি কি সুরোকে পতিতা কোরে আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালী দিয়ে যাবো! আমা হতে তা হবে না।" অকালী সিং চক্ষু মুছিল। দেখিয়া সুরবালার চক্ষু ছল ছল হইল। দেখিয়া মেম সাহেব আদর করিয়া সুরবালাকে

অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অকালী সিং এবং সাহেবকে অপেক্ষাকৃত একান্তে রাখিয়া তিনি বালিকাকে বৈঠকখানার অন্য সীমায় লইয়া গেলেন। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেবিলের উপর কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারদের নির্ম্মিত অনেক গুলি খেলেনা ছিল। মিসেস্ ডোনাল্ড একে একে সুরবালাকে সে গুলির পরিচয় জিজ্ঞাসার ছলে নানা কথায় তাহার মুখের হাসি দেখিলেন, তাঁহার শিক্ষিত সংযত রমণীহৃদয় অকালী সিংহের কৃতজ্ঞতা এবং সরলা বালিকার স্নেহ কোমলতায় গলিয়া গিয়াছিল।

এদিকে অকালী সিংহের বিনীত স্পষ্টবাদিতায় ডোনাল্ড সাহেব বুঝিলেন, তিনি তাহার হৃদয়ে একটু আঘাত করিয়াছেন। সচরাচর সাহেবেরা এটা বোঝেন না, জনবুলের বিরাট আদর্শে আমাদের সকল ক্ষুদ্র আশা ভরসা, সকল ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ "কুত" করিয়া থাকেন। সুশাসিত বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্নিহিত বিপদ যে এইখানে, মন্ত্রণাকুশল ইংরেজ রাজ আজও তা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ডোনাল্ড সাহেবও তাহা বড় বুঝিতেন না, কিন্তু মনুষ্যহৃদয় তিনি একটু একটু বুঝিতেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বড় তরফের ঘোড়সওয়ার রওনা হইতে বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। তার উপর ঘোড়সওয়ার বাহাদুর সেখ ক্রোশ তিনেক পথ মাত্র অতিক্রম করিয়া, তাহার ফুপার বাড়ী সিমজুলি গ্রামের পথের ধারে বটগাছতলায় যখন কালেক্টর সাহেবের ডাকের ঘোড়া বাঁধা এবং সহিসকে নিদ্রা-বস্থায় দেখিল, তখন সেই সিপাহির বেশে কুটুম্ববাড়ী গিয়া এক ছিলিম তামাক খাইয়া আসিতে তাহার বড় সাধ হইল। কিন্তু কুটুম্ববাড়ী গিয়া তখনি তখনি কে ফিরিয়া আসিতে পারে? এক ছিলিম তামাকের জায়গায় চারি ছিলিম এবং খোস গল্পের পর খোস গল্প চলিতে চলিতে শোনা গেল যে, কালেক্টর সাহেবের ডাক বদল ও গাড়ী রওনা ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অতএব, সদর রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের আইল পথে বাহাদুর সেখ যখন বড় তরফের দেউড়ীতে মহাব্যস্ত ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া এত্তালা করিল যে, সোজাপথে কালেক্টর সাহেবের গাড়ী ধরিবার চেষ্টা করিয়া সে ভারি ঠকিয়াছে, সমেম ডোনাল্ড সাহেব তখন মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়া গিয়াছেন।

কাজেই বেলা সাড়ে এগারটার আগে ম্যানেজারের অভা-বনীয় অবস্থার কথা ডোনাল্ড সাহেবের কর্ণগোচর হইল না।

দারগা পীরবক্স ঘোড়সওয়ার রওনার খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, এবং ভরসা করিতেছিলেন, মোকদ্দমার কতকটা কিনারা করিয়া একেবারে জনাব-আলীর কাছে রিপোর্ট লইয়া হাজির হইবেন। কিন্তু বাহাদুর সেখ ফিরিয়া আসিলে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। সদলবলে পীরবক্স যখন ছোট তরফের আম্‌বাগানে দেখা দিলেন, মেম ও সাহেবের ভোজন-টেবিলে তখন গল্প ও হাস্য যুগপৎ উছলিয়া উঠিতেছিল।

মিসেস্ ডোনাল্ড বলিতেছিলেন, "এই বালিকাকে দেখে আমার বড় মায়া হয়েছে। এলোচুলে আচম্‌কা যখন এসে সে আমার হাত ধরেছিল, তখন মনে হল, যেন কবিচিত্রিত বনবালিকা আমার সম্মুখে, তার পর ঐ প্রভুভক্ত দরওয়ানের মুখে মৃত পিতার কথা শুনে যখন তার চোক ছল ছল হ'ল, তখনও আমি বিচলিত হলাম, বালিকাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য পুতুলগুলির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে করতে দেখি, দিব্য তার বুদ্ধিশুদ্ধি। বালিকা এরি ভিতর ধর্ম্মতঃ বিধবা হয়েছে শুনেও ওর প্রতি আমি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়িছি। আমাদের দ্বারা অনাথা বালিকার স্থায়ী কোন উপকার যদি হতে পারে, তার চেষ্টা তুমি অবশ্য করবে, এই আমার অনুরোধ। আর ঐ প্রভুভক্ত দরওয়ানকে তুমি কি মনে কর? তাকে দেখে আমার মনে হয়েচে, কৃষ্ণবর্ণ নেটিভের বুকের ভিতর দৃঢ় বলিষ্ঠ মনুষ্যোচিত হৃদয় থাকতে পারে।"

ডোনাল্ড বলিলেন, "যথার্থই বালিকার বড় অসহায়াবস্থা,

তুমি বিচলিত হয়েছ, এতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। আমি স্থির করেছি, ওর ঋণভারগ্রস্ত বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ড-সের তত্বাবধানে রাখ্‌ব, এবং উহাকে সুশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করব। তাতে বিষয়টা ৪।৫ বছরের মধ্যে ঋণমুক্ত হবে, এবং ঐ সময়ে বালিকা এরূপ সুশিক্ষা লাভ করবে যে, সে, দেশীয় ঘৃণিত প্রথাগুলোকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে। তা হলে হিন্দুসমাজ তাকে জোর করে বিধবাবস্থায় রাখ্‌তে পারবে না। আর অকালী সিংহের কথা বল্‌চ? প্রথম দর্শ-নেই তাকে আমি একটা মানুষের মতন মানুষ বলে অনুভব করেছি। এরকম প্রভুভক্ত ভৃত্য সচরাচর দেখা যায় না। আমি মনে করি, ষ্টেট্‌ থেকে তার একটা উপযুক্ত পেন্‌সন্‌ হওয়া উচিত। কিন্তু বালিকার কাছে থাক্‌তে পেলে সে তার শিক্ষা ও মার্জ্জিত রুচির পথে সর্ব্বদা কণ্টকস্বরূপ হবে। এই ভোজপুরিয়াগুলার বীরের হৃদয় আছে, কিন্তু সে বীরত্ব এবং সাহস শিক্ষা দ্বারা সংযত হতে পায় না। কুসংস্কারান্ধ হয়ে অনেক সময় তারা হিংস্র পশুর মত ভীষণ হয়ে ওঠে।”

আহার সম্পূর্ণ করিয়া সাহেব দম্পতি অকালী সিংহকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এবং উভয়ে একবাক্যে তাহাকে ভরসা দিলেন যে, তাহার প্রভুকন্যার সম্বন্ধে আর তাহাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। অকালী সিংহের কানে সে কথা বড়ই মধুর শুনাইল। তাহার মনে হইল সাহেব মেমের রূপ ধরিয়া হরগৌরী মূর্ত্তি তাঁহাকে বরাভয় দান করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সুরবালার ভাগ্যসঞ্চারের আশায় আনন্দে আত্মহারা হইলেও অকালী সিং বুঝিল, রাত্রির ঘটনায় তাহার হৃদয়ে যে মলিনতা জন্মিয়াছে, সহজে তাহা দূর হইবে না। এই মুহূর্ত্তে সাহেবের সমক্ষে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনার কাছে অন্ততঃ আপনি সাফাই হইবার জন্য হৃদয় তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। করযোড়ে অকালী বলিল, "ধর্ম্মাবতার, স্বর্গীয় প্রভু আমার উপর যে ভার দিয়াছিলেন, আজ আপনি তাহা গ্রহণ করায় আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ঘটনাবশে আজ যদি আমি প্রভুগৃহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হই, প্রভুকন্যার জন্যে আমার মনে কোন অসুখ থাক্‌বে না। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।" অকালী সিং থামিল, যে কথাটা বলিবার জন্য প্রাণ তার আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল, কণ্ঠে তাহার ভাষা ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতে-ছিল না। তাহার উপর নিজের সেই অতিক্রোধের অসংযত অবস্থা মনে করিয়া অকালী সিং লজ্জায় মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া যাইতেছিল। আর কিছুই বলিতে না পারিয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে সে দৃষ্টি নত করিল।

এমন সময়ে চাপরাশী খোদা খাঁ আসিয়া এত্তালা করিল যে, দারোগা হাজির, বিশেষ সঙ্গীন্ কথা আছে। সাহেব

তাঁহাকে আসিতে বলিলেন। পীরবক্স খাঁ প্রথমতঃ মেমসাহেবকে তার পর স্বয়ং ম্যাজিষ্টর সাহেবকে যথারীতি সেলাম করিয়া কৈফিয়ৎ দিল যে, বড় এক সঙ্গীন্ মোকদ্দমার "তাখিখৎ লইয়া বিব্রত থাকায় এতক্ষণ তাঁবেদার জনাব আলীর খিজ্‌মতে হাজির" হইতে পারে নাই। সাহেব বাহাদুরকে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতে দেখিয়া পীরবক্স আপনার উর্দ্দু বহুল জবানি রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিত রিপোর্ট তাঁহার হাতে দিল।

অতঃপর পীরবক্স আদেশ মত আপনার লিখিত রিপোর্ট আপনি পড়িয়া ম্যাজিষ্টর সাহেবকে শুনাইয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, পড়িতে বড় একটা ভুল চুক হয় নাই, তবে কথায় কথায় "আৃস্ক" ও "রেফ" সংযুক্ত না করিলে সাধুভাষা হয় না, দারোগাজীর এই রকম একটা ধারণা থাকায় এবং তাহার উপর প্রায় প্রতি চারি অক্ষরের পর অ্যাঁ অ্যাঁ, ও "ওর নাম কি" প্রভৃতি শব্দালঙ্কার প্রযুক্ত হওয়ায়, পীরবক্সের রিপোর্ট খানি ডোনাল্ড সাহেবের সহিষ্ণুতাকে বিষম অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়াছিল। দারোগাজী রিপোর্টের শেষভাগে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা বলিতেছে বটে যে, ভূতে ম্যানেজারের সে দশা করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না থাকিলেও তাহার বিশ্বাস যে, রাজবাড়ীর লোকেদের যোগসাযোগে বিদ্রোহী প্রজাদের দ্বারা এ কার্য্য হইয়াছে।

ডোনাল্ড সাহেব অকালী সিংকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস

আছে কি না। অকালী শুষ্ক মুখে বলিল যে, "ভূত সে কখন দেখে নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নাই এ কথা বলা তার সাধ্য নহে। আর ঘটনাচক্রে অবস্থাবিশেষে মানুষ ভূতের মত কাজ করিতে পারে।"

সাহেব বলিলেন, "দারোগা বলিতেছে, তার বিশ্বাস, বড় তরফের লোকেদের যোগসাযোগে বিদ্রোহী প্রজারা ম্যানে-জারের প্রতি এ অত্যাচার করিয়াছে—তুমি অনেক কাল এখানে আছ, অকালী সিং, তোমার কি মনে হয় ইহা সত্য ?"

এতক্ষণ অকালী সিং আত্ম এবং আত্মেতর ভাবের সংগ্রামে আপনা-আপনি সংক্ষুব্ধ হইতেছিল। সাহেবের শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে সেও প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। প্রায় হাস্যবিকশিত মুখে, দৃঢ় ওষ্ঠ দন্তে চাপিয়া অকালী বলিল—"ম্যানেজার এই ছোট তরফের মুহুরি ছিল, সম্প্রতি বড়তরফে চাকরী পাইয়া সে পূর্ব্ব প্রভুর অনিষ্টচেষ্টা করিতেছিল। আমিই স্বহস্তে সে নিমকহারামটার এ দশা করিয়াছি।"

তখন অকালী সিং ডোনাল্ড সাহেবের প্রশ্নমতে একটি একটি করিয়া রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তারের রিপোর্টে ম্যানেজারের অবস্থা একটু ভাল জানিয়া ডোনাল্ড সাহেব তাহার জোবানবন্দী লইতে গেলেন। তখন অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে। স্বেচ্ছায় অকালী সিং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে গেল।

নিভিবার আগে প্রদীপ যেমন অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আহত মুমূর্ষুর তখন সেই অবস্থা। ইহলোক এবং পরলোকের সেই সন্ধিক্ষণে শান্ত মলিন গোধূলি-ছায়া আসিয়া জীবনালোকের অবশেষ টুকু ধীরে ধীরে আবৃত করিতেছিল। পরিশ্রান্ত দিবামান পূরবী মুখে বৈরাগ্যসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে যেমন মুদিয়া আসে, সিদ্ধেশ্বর রায় তেমনি নিজের পাপপঙ্কিল জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ছোট তরফের অনিষ্টকামনার কথা, অকালী সিংএর প্রতি অবিচারের দৃশ্য, আবছায়ার মত মনে পড়িতেছিল। এমন সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কে তাহার সে দশা করিয়াছে। অনুতপ্ত হৃদয়ে সিদ্ধেশ্বর রায় বলিল—"কেহ না, বিধাতা আমার পাপের শাস্তি দিয়াছেন।"

অকালী সিং নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া ডোনাল্ড সাহেবের শ্রম লাঘব করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি বড় খুসী হন নাই। কঠোর কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে অতিক্রম

করিয়া তাঁহার হৃদয়ের নিভৃতে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা বলিতেছিল, "কোন রকমে এ লোকটা কি বাঁচিয়া যাইতে পারে না?" অতএব সিদ্ধেশ্বর রায়ের উত্তর শুনিয়া সাহেব আশ্বস্ত দৃষ্টিতে অকালী সিংএর মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সে মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ ভয়মাত্রশূন্য বটে, কিন্তু বিস্ময় এবং কৌতূহলবর্জ্জিত নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ আবার সুধাইলেন, "ছোটতরফের জমাদার অকালী সিং বলিতেছে যে, তুমি তাহাকে অপমানিত করায় রাগের মাথায় সে তোমায় ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল, ইহা কি সত্য?"

সিদ্ধেশ্বর ক্ষীণ জড়িত ভাষায় উত্তর দিল, "অকালী সিংএর কাছে আমি অনেক উপকার পেয়েছি। কখনও প্রত্যুপকার কর্‌তে পারিনি। তার দ্বারা আমার অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব। আমি পাপী, আপনি বিচারক, দেখ্‌বেন, আমার জন্য তার কোন বিপদ না ঘটে।" আর কথা সরিল না, সিদ্ধেশ্বর রায় আবার অজ্ঞান হইল।

স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া অকালী সিং হৃদয়াবেগে বলিয়া উঠিল—"বাবু, তুমি এত মহৎ, তা জান্‌তাম না। আমি কবে কি সামান্য উপকার করেছিলাম, তাই ভেবে আজ তুমি আমায় বাঁচাবার জন্যে আসল কথা গোপন কর্‌লে। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল, কিন্তু আমায় নরকে পচ্‌তে হবে।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাহেব দম্পতী কুণ্ডলার পদ্মাতীরে পাদ-

চারণ করিতেছিলেন, সম্মুখে বালুকাসমুদ্রের বুকে পদ্মার শান্ত গভীর প্রবাহরাশি অলসভাবে বহিয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টিপাত হওয়ায়, তীরসংলগ্ন নদীসৈকতে নবীন কোমল তৃণরাজি উদ্ভিন্ন হইয়াছে; অদূরের আম্রকানন হইতে বউ-কথাকও পাখীর মর্ম্মকথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

বিবি বলিতেছিলেন, "আচ্ছা, বউকথাকও না ভেবে যদি ভাবা যায়, কল্‌কত্তা যাব, তাও ত হতে পারে। আমরা যদি মনে করি 'Forget me not,' তাতেও কোন অমিল হয় না। কিন্তু নেটীভেরা ঐ এক বউকথাকও ছাড়া আর কিছু ভেবে উঠ্‌তে পারে না।"

সাহেব অন্য মনে ভাবিতেছিলেন। কথাটা ঠিক্ মনের মত হওয়ায় বলিয়া উঠিলেন, "Sentiment ! It is sentiment that governs the world and not reasons. তার সাক্ষী দেখ না কেন, অকালী সিংকে নিয়ে কি বিপদেই আমি পড়েছি।"

মিসেস্ ডোনাল্ড হাতপাখাখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া বায়ু সঞ্চালিত করিতে করিতে বলিলেন, "আহত ম্যানেজার বলিতেছে, অকালী সিংএর কাছে সে উপকৃত; উভয়ের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই। অকালী সিং নিজে দোষ স্বীকার করিতেছে বটে, কিন্তু হতে পারে তার মস্তিষ্ক তেমন সহজ অবস্থায় নেই। প্রমাণের অভাবে এমন স্থলে তোমার সঙ্কট কোন্‌খানে, আমি ত বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।"

ডোনাল্ড। সন্দেহ হয় বটে যে, অকালী সিংএর মস্তিষ্ক হয় ত বিকৃত হয়েচে, কিন্তু আমি নিজে তার কোন কারণ দেখ্‌চিনে। প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু আমার মনের বিশ্বাস এই যে, অকালী সিংএর কথাই ঠিক্‌, সে বীরের যোগ্য সত্য কথা বলেচে। এও বেশ বুঝতে পার্‌চি যে, ম্যানেজার মৃত্যুশয্যায় পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করে আহতকারীকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু এটাও ভাব্‌বার বিষয় যে, এতটা মহত্ত্বের দান প্রতিদান কি নেটীভদের মধ্যে সম্ভব?

ডোনাল্ডপত্নী স্বামীর কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "এ সব কথা সত্য হলে আমরা যে নেটীভদের কাপুরুষ বলে থাকি, তার কোন ভিত্তি থাকে না।"

ডোনাল্ড। সাধারণতঃ দেশীয় লোকেদের ভিতর কৃতজ্ঞতার ভাবটা এমনি দুর্ল্লভ যে, নেটীভ চরিত্রের পঁচিশ বৎসর ব্যাপী অভিজ্ঞতায় এ সব কথা আমি সম্পূর্ণ প্রত্যয় করে উঠতে পার্‌চিনে। ইংরেজ রাজত্বে সর্ব্বাপেক্ষা উপকৃত এখনকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দেখ না কেন! বাবুগুলো এই শ্রেণী থেকে উৎপন্ন, কিন্তু তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে ভারি অহঙ্কৃত হয়ে উঠেচে, এবং তাদের সম্পাদিত খবরের কাগজগুলো অবিরাম অসন্তোষ উদ্গার করে ভাবী রাজদ্রোহের সূচনা কর্‌চে।

ডোনাল্ড সাহেব অনেকক্ষণ আর কিছু বলিলেন না। তাঁর ভারতীয় জীবন দুইটা পরস্পরবিরোধী শক্তিসংঘাতে বরাবর

সংযত হইয়া আসিয়াছে। নেটীভ-বিদ্বেষের বিশেষ অভাব ছিল না বটে, এবং মাঝে মাঝে নিরীহ আমলাদিগকে অভ্রান্ত ভাষায় I hate you Babus বলিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সহজ উদার চরিত্র কার্য্যকালে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনেক সময়ে মহত্ত্বে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

তাঁবুতে ফিরিবার সময় উভয়ে এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পথে দারোগা এত্তালা করিল, ম্যানেজারের মৃত্যু হইয়াছে। দারোগা সাহেবের মনোগত অভিপ্রায়, অকালী সিংকে গ্রেপ্তার করেন, কিন্তু সাহস করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে সে কথার "আরজ" করিতে পারিলেন না। গভীর রাত্রে ডোনাল্ড সাহেব অকালী সিংকে কাছে ডাকিলেন। সে আসিলে সুধাইলেন, ম্যানেজারের মৃত্যুসংবাদ তাহার গোচর হইয়াছে কি না?

অকালী সিংও তা শুনিয়াছিল, অতএব কেবল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

ডোনাল্ড বলিলেন, "অকালী, তুমি যে ম্যানেজারকে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিলে, তোমার নিজের কথা ছাড়া তার অন্য প্রমাণ নেই। আহত ব্যক্তি নিজে তোমায় সকল দোষ থেকে মুক্ত করে গেছে। এ অবস্থায় আইন তোমায় স্পর্শ করিবে না।"

অকালী সিং করযোড়ে বাষ্পাকুল-লোচনে ভিক্ষা করিল, তাহাকে জেলে দেওয়া হোক্, কেন না, তাহাকে ক্ষমা করিলে জীবন তাহার দুর্ব্বিবহ হইয়া উঠিবে।

ডোনাল্ড সাহেব হাসিলেন। বলিলেন, "অকালী সিং, বীরপুরুষ তুমি, জেলে যাইতে ভয় কর না; কিন্তু তোমার মত ব্যক্তিকে সাধারণ পাপীদের সঙ্গে বাস করতে হবে, এ চিন্তায় আজ দুদিন আমি আকুল আছি। আমার আদেশ, কাল প্রত্যূষে তুমি স্বদেশে চলে যাবে, এবং পাঁচ বৎসর কাল অর্থাৎ যতদিন তোমার প্রভুকন্যা সাবালিকা না হন, ততদিন তুমি তাঁকে দেখা দিবে না। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ মাসে মাসে তোমার মাসহারা পাঠাবেন।"

অকালী সিং জীবনে আর কখন কাহারও কাছে নতজানু হয় নাই। আজ ডোনাল্ড সাহেবের কাছে হইল। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমি পাঁচ বৎসর কাল প্রভুকন্যাকে দেখ্‌তে পাব না, আমার পক্ষে এর চেয়ে গুরুতর শাস্তি আর কিছু হতে পারে না। আমার পাপের এই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত! হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য। আমার একমাত্র ভিক্ষা, আপনি ছোটতরফের বিষয়টুকু রক্ষার ব্যবস্থা করতে দেরি মাত্র করবেন না।"

সাহেব অকালী সিংকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার হাতে একখানি কাগজ দিলেন। বলিলেন, "যদি কখন বিপদে পড়, রাজপুরুষদের ইহা দেখাইও।"

ডোনাল্ড সাহেবের একটি আদেশ অকালী সিং পালন করিতে পারে নাই। তিনি পাথেয়স্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলে, বিনীত অথচ দৃপ্তভাবে তাহা প্রত্যাখান করিয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউটে দীনেন্দ্রনাথের এক মোসাহেব জুটিয়াছিল। ইনি অনেকগুলি নাবালককে অকালে সাবালকত্বে পরিণত হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং সাধারণতঃ ওয়ার্ডদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইঁহার আশ্চর্য্য শক্তি এই ছিল যে, রিক্ত-হস্তে ওয়ার্ডদের যত টাকারই কেন দরকার হউক না, তাহা-দের এক একটা সহি পাইলেই তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

এ হেন গুণী লোকের নামটি সম্প্রতি এ পক্ষ লেখকের ঠিক্ মনে আসিতেছে না। অতএব কবিবর সেক্ষপীয়রের প্রসিদ্ধ কবিতা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁকে যদি চারু বাবু বলিয়া পরিচিত করি, এবং সেই নামেই ডাকি, তাতে এমনই কি বিশেষ ক্ষতি?

চারু বাবুর ইতিহাস যিনি জানিতে চাহেন, তাঁহাকে বলিয়া রাখি যে, মোসাহেবী ব্যবসায় তাঁহার পুরুষপরম্পরাগত—তবে কিছু কিছু কণ্ট্রাক্টের কাজও তিনি সরবরাহ করিয়া থাকেন। যে সকল ওয়ার্ড, ইন্‌ষ্টিটিউট উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে চারু বাবুর ঘনিষ্ট যোগ। কেহ কেহ তাঁহাকে মাসহারা পাঠাইয়া দেন, এবং একজন দেওয়ানী দিতে চাহিয়াছিলেন। শুনিয়া ওয়াইন-মার্চেণ্টগণ বলিয়াছিল, "বাবু

আপনি অমন কর্ম্ম করিবেন না। আমরা আপনার কমিশন বাড়াইয়া দিব। সেই অবধি চারু বাবুর পৈতৃক ব্যবসাটার উপরই বেশী ভরাভর। বাগ্বাজারের সান্ন্যাল পরিবারের এক যুবক এই সময়ে ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউটে থাকিতেন। তাঁহার নাম অসিতনাথ। দীনেন্দ্রের চেয়ে বয়সে কিছু বড়, এবং ইন্‌ষ্টিটিউট-সুলভ দোষমাত্রশূন্য। অন্যান্য গুণের মধ্যে সঙ্গীতবিদ্যায় ইহাঁর অনুরাগ ছিল, এবং বেশ সুকণ্ঠ। দীনেন্দ্র অশ্বারোহণে সুপটু দেখিয়া অসিতনাথ আপনা হইতে তাহার সঙ্গে আলাপ করিলেন, এবং রোজ প্রাতে উভয়ে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেন। অসিতনাথ, চারুকে একটু একটু চিনিতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ইঙ্গিতে দীনেন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন। তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিল। দীনেন্দ্র মাতার একটি গুণ খাঁটি মাত্রায় অধিকার করিয়াছিলেন,—পেটে কথা রাখিতে পারিতেন না। অসিতনাথের ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া চারুচন্দ্রের কাণে উঠিল। সংক্ষেপে কথাটা শাখাপল্লবিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়ের খবরে আসিল, এবং অসিতনাথ অল্পবিস্তর ভৎর্সিত হইলেন। দীনেন্দ্রনাথ অতঃপর নির্ব্বিরোধে শনৈঃ শনৈঃ চারুর জালে পড়িলেন।

দীনেন্দ্রনাথের খরচপত্র বাড়ী হইতে যথেষ্ট আসিত, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব চারু বাবু অন্য উপায়ে তাহাকে বাধ্য করিতে ব্যস্ত হইলেন। বীডন পার্কে দীনেন্দ্র মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইত, পদব্রজে ভ্রমণ ব্যায়ামের একটা

প্রধান অঙ্গ বলিয়া সব দিন গাড়ী সঙ্গে থাকিত না। চারু বাবু এই সময়ে অকস্মাৎ দীনেন্দ্রনাথের ভারি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন,—সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন।

বৈশাখ মাসের শেষাশেষি একদিন উভয়ে বীডন্ গার্ডনে বেড়াইতেছিলেন। সন্ধ্যার একটু আগে ঝড় উঠিল। চারু বাবু একখানা গাড়ী ভাড়া করিবার জন্য ছুটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু বৃষ্টিপতন আরম্ভ না হইলে ফিরিলেন না। গাড়ী পাওয়া যায় নাই, অগত্যা দীনেন্দ্রনাথ চারু বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ একটা বাড়ীর বারান্দার নীচে গিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁর মাথায় ও চাদরে ফোঁটাকতক বৃষ্টি পড়িয়াছিল।

সহসা একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাঁহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং স্নেহকোমল স্বরে বলিল, "আহা, কার বাছা তোমরা বাবা! বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চো?" প্রৌঢ়া অভ্যস্ত প্রগল্‌ভতার সহিত উভয়ের বস্ত্র ও মস্তক স্পর্শ করিয়া আবার বলিল,—"কাপড় চোপড় সব ভিজে গেছে যে বাবা! তোমরা দেখ্‌চি বড়লোকের ছেলে, দুঃখিনীর দুয়োরে কত ভাগ্যিস্ দাঁড়িয়েচো। বল্‌তে ত পারিনি, যদি দয়া করে ওপরে গিয়ে কাপড় চোপড় ছাড়। নইলে সর্দ্দিজ্বর হবে!" চারু বাবু দীনেন্দ্রনাথের লজ্জানত মুখের কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন—"ক্ষতি কি?" দীনেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, তার পর চারুর সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গেল।

দীনেন্দ্র উপরে উঠিয়া দেখিল, প্রৌঢ়া নিতান্ত দুঃখিনী

নহে। বসিবার ঘরটি আস্‌বাবে পূর্ণ, এবং বেশ সুসজ্জিত; আর পরিবর্ত্তনের জন্য যে বস্ত্রাদি লইয়া আসিল, তাহাও মূল্যবান্‌। চারুকে দশ মিনিটের ভিতর সে গৃহে চিরপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিয়াও দীনেন্দ্র বিস্মিত হইতেছিল।

ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেলে দীনেন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউটে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌-মলের শব্দ হইল। সম্মুখে আপাদমস্তক অলঙ্কারভূষিতা সুন্দরী তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে স্ত্রীজাতিসুলভ কোমলতা এবং লজ্জার লেশ ছিল না। সে হাসিয়া দীনেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল—"দয়া করে যখন এসেছেন, এত শীগ্‌গির যেতে দেবো না।"

* * * * *

আমরা এই পাপচিত্র বিস্তারিত করিব না। দীনেন্দ্রের অধঃপাত কিরূপে সুরু হইল, তাহাই দেখাইলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন হইতে মাতৃদত্ত অর্থে দীনেন্দ্রের আর বড় কুলাইত না। মাকে নানা উছিলায় ভুলাইয়া টাকা আদায় করা সহজ হইলেও, একেবারে দশ বিশ গুণ খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় রোজ রোজ সে জন্য চিঠিবাজি করিতে তাহার কেমন লজ্জা লজ্জা

করিত। প্রিয়বন্ধু চারু বাবু তাহার উপর বুঝাইয়া দিলেন, তাঁর একটা সহি পাইলেই বিস্তর টাকা তিনি আনিয়া দিতে পারিবেন; সাবালক হইলে পর সে দেনা শোধ দিলেই চলিবে। মাকে লুকাইয়া বাবুগিরি করার এমন একটা সহজ উপায় থাকিতে পারে, দীনেন্দ্রের সে জ্ঞান কস্মিন্ কালে ছিল না—অতএব সেটা আবিষ্কার করিয়া দেওয়ার জন্য চারুকে সে ত্রিসংসারে একমাত্র বন্ধু বলিয়া জানিল। ইহার ফলে বছরখানেকের ভিতর মহাজনের কাছ থেকে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা দীনেন্দ্রের হ্যাণ্ডনোটে বাহির হইয়া আসিল; তার মধ্যে, বলা বাহুল্য, বিশ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র নাবালকের দর্শন লাভ করিয়াছিল।

এই হ্যাণ্ডনোট কাটার ব্যাপারটা রাজধানীতে যতই সুপরিচিত হউক না কেন, মফঃস্বলে তাহার তেমন চলন নাই। যখনকার কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তখন রাজধানীতেও তাহা নিতান্ত সঙ্গোপনে সম্পন্ন হইত। অতএব বেনামী চিঠিতে তাহার কথা জ্ঞাত হইয়া সরলহৃদয়া হরিপ্রিয়া দেবী যে ভাবিয়াছিলেন, তাঁর কোকনকে কেহ অস্ত্রাঘাত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তাতে তাঁকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। জায়গীরের নায়েব ফণীভূষণ তলাপাত্র কথাটার অর্থ ব্যাখ্যার দায়িত্ব স্কন্ধে না লইলেও, মনিবের কাছে নিতান্ত বেকুব বনিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, চিঠিখানা লেখা কোন শত্রুর কাজ। কিন্তু ইহাতে হিতে

বিপরীত ঘটিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র শত্রু-বেষ্টিত হইয়াছে, এবং কোন্ দিন কার হাতে মারা যাইবে, ঠাকুরাণী ইহা ধ্রুব বুঝিলেন, এবং আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। শেষে সদর হইতে উকীল আসিয়া কর্ত্রী ও তাঁহার আমলাবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন যে, হ্যাণ্ডনোট কাটিলে মানুষ হঠাৎ মরে না সত্য, কিন্তু মৃত্যুর সে একটা পথ বটে। উকীলের পরামর্শে স্থির হইল, দিনকতক কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে পীড়ার ভাণ করিয়া থাকিতে হইবে। তার পর দরখাস্ত করিলে বোর্ড কোকন বাবুকে বাড়ী পাঠাইয়া দিতে পথ পাইবেন না। এবং তিনি একবার বাড়ী আসিলে সহজে আর তাঁকে কলিকাতায় পাঠান হইবে না।

অকালী সিং কুণ্ডলা ত্যাগ করার প্রায় দুই বৎসর পরের এ ঘটনা। ডোনাল্ড সাহেব তখনও জেলার কালেক্টার, এবং তাঁহার যত্নে ছোটতরফের বিষয় আশয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হইয়া ঋণমুক্ত হইয়াছে। উভয় এষ্টেট্ একজন ম্যানেজারের "হাওয়ালে" হওয়ায়, বড় এবং ছোট তরফে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষায় ডোনাল্ড দম্পতির আন্তরিক অনুরাগ। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, সুরবালা এবং দীনেন্দ্রপত্নীকে সদরে আনিয়া লেখাপড়া শিখাইবেন। ইহাতে সেই স্ত্রীশিক্ষার শৈশবদিনে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কালেক্টর স্বয়ং সস্ত্রীক কুণ্ডলায় গিয়া হরিপ্রিয়ার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন যে, লেখাপড়া

শিখিলে হিন্দুর মেয়ে বিধবা হয়,—তার সাক্ষী তিনি নিজে স্বামীর জেদে ক, খ, শিখিয়া, এবং নাম সহি করিতে জানিয়া, এক বছরের ভিতর একাদশী করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে সাহেব হাসিয়া উঠিলে কর্ত্রী হাতজোড় করিয়া মেমকে জানাইয়াছিলেন—লেখাপড়া শিখাইতে হয় ত কুণ্ডলাতেই যেন তার ব্যবস্থা করা হয়। নইলে মেয়ে কি বউ যদি লেখা পড়া শিখিতে সদরে যায়, তাতে প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত মৈত্র-কুলে কালি পড়িবে। কাজেই মিস্ ভার্জ্জিনিয়া নামে শিক্ষয়িত্রী কুণ্ডলায় আসিলেন।

লেখাপড়ায় সুরবালার দিব্য বুদ্ধি, বিশেষ পিতার যত্নে আগে হইতেই সে পড়া শুনা করিত। কিন্তু দীনেন্দ্রপত্নী কুসুমমালাকে লইয়া শিক্ষয়িত্রীকে কিছু মুস্কিলে পড়িতে হইল। কুসুম খেলায় গল্পে যতটা রাজি, পড়াশুনায় ততটা নহে। আর শাশুড়ী তাঁকে মেমগুলাকে হিংস্র জন্তুর মত ভয় করিতে শিখাইয়াছিলেন। ক্রমে শিক্ষয়িত্রীর সংসর্গে অভ্যস্ত হইলেও কিন্তু ছাত্রীর প্রীতিবন্ধন তেমন দৃঢ় হইল না। সুর-বালাকে মেমেদের সঙ্গে আত্মীয় অন্তরঙ্গের মত মিলিতে মিশিতে দেখিয়া বধূ নাসা কুঞ্চিত করিতেন, বলিতেন—"ঠাকুরঝি ভাই, তোর কি সাহস? মেমদের ফ্যাকাসে রং দেখ্‌লে আমার গা ঘ্যাকার ঘ্যাকার করে।"

সুরবালার উপর মিসেস্ ডোনাল্ডের অপত্যবৎ স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল। তাহার মধুর অথচ তেজস্বী চরিত্রগুণে সে

বিংশ পরিচ্ছেদ

স্নেহ দিনে দিনে ঘনীভূত হইল। শেষে এমন হইল যে, মাঝে মাসে তাহাকে দেখিবার জন্য দুই এক বার কুণ্ডলায় না আসিলে ডোনাল্ডপত্নীর চলিত না। প্রতিবার বিদায়কালে সাশ্রুনয়নে মিসেস্ ডোনাল্ড সুরবালার পিট্ থাবড়াইয়া বলিতেন, "দেখ সুরো! তোমায় সুশিক্ষিতা করে সৎপাত্রে পরিণীতা হতে দেখ্‌লে আমার জীবনের একটা প্রধান সাধ পূর্ণ হবে।" সুরো লজ্জানত মুখে নিরুত্তর থাকিত, তাহাতে বালিকার সহজ শ্রী শত গুণে বাড়িয়া উঠিত। দেখিতে দেখিতে তাহার গণ্ডে স্নেহের অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া মেম সাহেব বগীতে গিয়া উঠিতেন, এবং রুমালে চক্ষু মুছিতেন। ভগী বড় আশা করিত, মেম সাহেবের অনুরোধে বড় হইয়া সুরো বিবাহ করিতে রাজি হইবে। কিন্তু জমাদার চলিয়া যাওয়ার পর থেকে, সে নিজে আর কখন বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিত না।

শেষ বিদায়ক্ষণে অকালী সিং বুড়ী ভগীর কাছে বিদায় হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রাণ ধরিয়া সুরোকে দেখা দিতে পারে নাই। জমাদার দুই বছরের ভিতরও ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, সুরো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত—মাঝে মাঝে ভগী দাসীকে সুধাইত, বড় বাড়ীর জেঠাইমা যে বলেন, জমাদার ম্যানেজারকে খুন করে গেছে, আর কখন ফিরে আস্‌বে না, একি সত্যি ভগী বেটী? ভগী দীর্ঘ নিশ্বাস সংযত করিয়া বলিত—"তা নয় কুকি, কালেক্টর সাহেবের কাছে ছুটি নিয়ে

জমাদার তীর্থ কর্‌তে গিয়েছে, আবার এলো বলে। তুমি কাঁদ্‌বে কাটবে বলে তোমায় বলে যায় নি।”

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নাবালক দীনেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডোনাল্ড সাহেবও এক উড়া চিঠি, পাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, চারুচন্দ্র নামে জুয়াচোর তাহার সহি লইয়া অতিশয় বেশী সুদে রোজ রোজ বিস্তর টাকা কর্জ্জ করিতেছে, কিন্তু ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষেরা চারুর চালাকীতে অন্ধ হইয়া আছেন, ইত্যাদি। পত্রলেখক হিন্দিতে বলিতেছে যে, অমুক অমুক মহাজন কম সুদে টাকা দিতে চাহিলেও, চারু বাবু নিজের পছন্দসই উত্তমর্ণদের অনুরোধ এড়াইতে পারে না; বিশেষ, সে সব স্থলে তার শত করা পঁচাত্তর টাকাই লাভ। বহুদর্শী ডোনাল্ড সাহেব বুঝিলেন, এই চিঠির মূলে সত্য আছে, কেন না, বেনামী লেখক যেই হোক্, সে কোন মহাজনসম্পর্কীয় বটে। গোপনে তিনি বোর্ডের সেক্রেটারিকে চিঠি লিখিলেন যে, ইহার অনুসন্ধান হউক।

এই সময়ে টমসন্ সাহেব ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউটের উপর আড়ে হাতে লাগিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত রিপোর্টে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। অতএব বোর্ডের মেম্বরেরা ডোনাল্ড সাহেবের ডেমি-অফিসিএল চিঠি পাইয়া স্থির করিলেন,

এ একটা পরীক্ষাস্থল বটে। এক জন সুযোগ্য ডিটেক্‌টিভের হাতে অনুসন্ধানের ভার পড়িল।

আর একবার আমাদিগকে বীর্ডন্‌-পার্ক-সন্নিহিত সেই পাপপুরীটার একটা চিত্র দিতে হইতেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দীনেন্দ্রনাথের দিল্‌জান আজ সাজসজ্জায় একটু বেশী রকম মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। এবং ফরমাইস দিয়া কতক গুলো বেলফুলের মোটা মোটা মালা তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। পুষ্পমালা প্রেমবন্ধনের নিত্য উপায় হইলেও, দিল্‌জানের তাহাতে মন উঠে নাই, আজ তার মনে আকাঙ্ক্ষার ঝড় বহিতেছিল, কাজেই ফুলের "কাছির" ব্যবস্থা না করিয়া সে স্থির হইতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, যথাসময়ে দীনেন্দ্রনাথের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, চারু বাবুর কাঁধে ভর দিয়া অস্থিরপদে তিনি সে পুষ্পগৃহে উপনীত হইলেন।

দিলজান বলিল—"রাজা! আপনার দেশে তুমি রাজা, কিন্তু এ আমার রাজত্ব। কেমন, মান কি না?" দীনেন্দ্র আসিয়াই "পানে দিলেন মন"। রুমালে মুখ মুছিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "আলবৎ!"

"তবে রাই রাজার হুকুমে আজ্‌ তোমার বন্ধনদশা। জরিমানা না দিলে খালাস নেই।"

এই বলিয়া দিলজান সেই সুদীর্ঘ এবং কাছির মত মোটা মোটা বেলফুলের গড়ে দিয়া দীনেন্দ্রনাথকে হাতে পায়ে

বাঁধিয়া ফেলিল। দীনেন্দ্রের চেতনা লোপ হইবার বড় বেশী দেরী ছিল না, কিন্তু বন্ধনে পানে বাধা পড়ায় জরিমানার হুকুমটা যাহাতে একটু শীঘ্র শীঘ্র পাস্ হয়, সে জন্য মহাব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দিলজান চারু বাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল, চারু ইশারায় বলিল, "বিশ হাজার!"

দিলজান বলিল, "দেখ্ রাজা, তোর অনেক অপরাধ মাপ করেছি, আজ জরিমানা হাজার মোহর।"

পরমহিতাকাঙ্ক্ষী চারুচন্দ্র কল্পিতরোষে বলিলেন, "এ বড় অন্যায় তোমার দিলজান। আগে রাজা সাবালক হোক, তখন এ সব করো। সে দিন জড়োয়া গহনায় দশ হাজার টাকা নিয়েছ—আজ্ আবার প্রায় বিশ হাজারের দাবি। এত হ্যাণ্ডনোট কাট্তে আমার ভয় হয়।" দিলজান ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিল, "তোর কিরে গোলাম!" দীনেন্দ্র বন্ধনযন্ত্রণা অনুভব করিয়া যথাসম্ভব উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিলেন, "আচ্ছা, দে দেও।"

চারু কক্ষান্তরে গিয়া হ্যাণ্ডনোট লিখিতে বসিল—দিলজান সঙ্গে সঙ্গে গেল।

এমন সময়ে নীচে এক খানা গাড়ী আসিয়া লাগিল। ডিটেক্টিভ সঙ্গে স্বয়ং ডোনাল্ড সাহেব আসিয়া উপস্থিত। দীনেন্দ্রনাথকে বন্ধনদশায় দেখিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "দীনেন্দ্র! ঢের বিদ্যা শিখিয়াছ। তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, কলিকাতা আসিয়া সে খবর পাইয়া

নিজে আমি ইনষ্টিটিউটে গিয়াছিলাম। একেবারে অধঃপাতে গেছ। এখন চল।

দীনেন্দ্র প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দিলজান সঙ্গে যাবে তো?"

ততক্ষণে চারুচন্দ্র খিড়কীর পথে সটান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ডিটেক্‌টিভের রিপোর্টে বোর্ড জানিতে পারিলেন যে, দীনেন্দ্রনাথের দেনা অনেক গুলি, নানারূপে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই অনুসন্ধানের ফলে আরও দুই চারি ওয়ার্ডের বিস্তর বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িল। টমসন সাহেবের আরোপিত দোষগুলি প্রায় অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হওয়ায়, ইনষ্টিটিউট পরে কিরূপে উঠিয়া গিয়াছিল, আমরা সে কাহিনী সবিস্তারে লিখিতে বসি নাই। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি, এই টমসন সাহেবই সেদিন বাঙ্গলার ছোট লাট হইয়াছিলেন।

ডোনাল্ড সাহেব দীনেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া কুণ্ডলায় আসিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, দিনকতক সহরের প্রলোভন হইতে দূরে থাকিলে নাবালক সুধরাইয়া উঠিতে পারিবে। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সে সম্বন্ধে অনেক সলা পরামর্শ দিয়া গেলেন। মিশনরি-কন্যা মিস্ ভার্জ্জিনিয়ার প্রতি ভার হইল, যথাসাধ্য তিনি সেই উচ্ছৃঙ্খল অধঃপতন নিবারণ করিবেন।

রাজধানীর সে চারুচন্দ্র সম্প্রতি দীনেন্দ্রনাথের স্কন্ধ ত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু খাস কুণ্ডলাতেও মোসাহেবের তেমন অভাব ছিল না। লক্ষ্মীর বাহন যেমন কালপেচক, বড়মানুষীর বাহন তেমনি মোসাহেব। অতএব, কুণ্ডলায় বুনিয়াদী মোসাহেব দু পাঁচ ঘর ছিল না, এমত নহে। এই সব বংশের কুলধরদের ভিতর কেহ কেহ বাল্যে দীনেন্দ্রের সহচর ছিল, এবং বুলবুলির লড়াই ও কবুতরের খেলা হইতে মাষ্টার পণ্ডিতের কাপড়ে ছাপ দেওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বকার্য্যে বাল্যসখার সহায়তা করিয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া দীনেন্দ্রনাথ ছেলেবেলার প্রিয় খেলাগুলি এবং তাদের সঙ্গীদের ভুলিয়া গেলেও, তাহারা কিন্তু কিছুই ভোলে নাই। বরং তাহারা সপরিবারে ভরসা করিতেছিল, কোকন বাবু সাবালক হইলে তাহাদের মাসহারা মিলিবে। অতএব তাহারা সব এখন আসিয়া জুটিল। দীনেন্দ্র তাহাদের মধ্যে কয় জনকে দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন; কেন না, তাহাদের পশ্চাদ্দেশে ছোট বড় শিখা ঝুলিতেছিল, এবং কণ্ঠে তুলসীমালারও অপ্রতুল ছিল না। সেই সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম পেঁচার নক্‌সা" বাহির হইয়াছিল। ইংরেজী-আলোকপ্রাপ্ত যুবকেরা তাহার তীব্র বিদ্রূপস্রোতে দেশীয় অধিকাংশ রীতি নীতি ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তখন মদ খাওয়া এবং নিষিদ্ধ পান ভোজন কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের চক্ষে সভ্যতার একটা প্রধান আসবাবের মধ্যে। পল্লীগ্রামেও সংস্কারের ঢেউ উঠিতেছিল। দীনেন্দ্র-

নাথ ভাবিলেন, সভ্যতালোকপ্রাপ্ত তিনি সেই ভণ্ডগুলোর টীকি কাটিয়া এবং মালা ফেলাইয়া কুণ্ডলাকে যদি সভ্য ভব্য না করিতে পারেন, তবে বৃথায় ওয়ার্ড ইষ্টিটিউট্ তাঁহার শিক্ষা দীক্ষার ভার লইয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে, হুতোম প্যাঁচার বোলচালে এবং দীনেন্দ্রের হাসির চোটে, শতকরা নব্বই জনের ধারণা হইল যে, স্বর্গে উঠিবার একমাত্র সিঁড়ি, বড় মানুষের অনুগ্রহ—শিখা, মালা বা তিলকধারণ নহে। ইহাতে দুই চারি দিনের ভিতর বিস্তর লম্বা লম্বা টীকি স্বহস্তে কর্ত্তন করিয়া বিজয়-নিশান-স্বরূপ দীনেন্দ্র সে গুলিকে একটা কামরার দেওয়ালে সাজাইয়া রাখিলেন। যে দুই চারি জন তর্ক বিতর্ক করিল এবং বলিল, "টীকি মালা নইলে যে আমাদের ফলার বন্দ গো কোকন বাবু! তোমার মা কি আর তা হলে আমাদের রাধাগোবিন্দ-জীর দরওয়াজায় ঢুক্‌তে দেবেন?" দীনেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে আশঙ্কা নাই, কেন না, সাবালক হইলে তিনি স্বয়ং রাধাগোবিন্দজীউকেও "পেগ্" ধরাইবেন।

শেষে এমন হইল যে, হরিপ্রিয়া ব্রাহ্মণভোজনের জন্য ফলাহার-গত-প্রাণ কুণ্ডলা-সমাজে দ্বাদশটি সটীক এবং শুদ্ধ দ্বিজও খুঁজিয়া পান না। মাঝে মাঝে খবর পান, আহারের জন্য নিহত পক্ষীদের পাখা উড়িয়া উড়িয়া ঠাকুর-বাড়ীর প্রাঙ্গণ ছাইয়া ফেলে। এইরূপে দুই তিন দিন রাধাগোবিন্দজীর ভোগ নষ্ট হইল। শুনিয়া শুনিয়া হরিপ্রিয়া খুব কাঁদেন

কাটেন এবং মাথা খোঁড়েন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া ছেলেকে কিছু বলিতে সাহস হয় না, পাছে সে আবার কলিকাতায় পলাইয়া যায়, কি আর একটা কিছু করিয়া বসে।

মিস্ ভার্জ্জিনিয়ার কাছে কিন্তু দীনেন্দ্রনাথের ভারি পসার—কেন না, তিনি একদিন তাঁহার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া বিজয়-নিশান-স্বরূপ সেই কর্ত্তিত শিখাগুলি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তার উপর দেখা হইলেই মেম্‌কে বলিতেন, "আমার গৃহিণীকে আজও Civilised করিতে পারিলেন না? কই দেড়হাত ঘোমটা যে কিছুতে ঘোচে না! আগেকার 'ফুলেদের' মত লজ্জা দেখে আমার গা জ্বালা করে! আমার যদি মেম্‌সাহেব, আপনাদের দেশে জন্ম হ'ত!" মহা খুসী হইয়া মিস্ ভার্জ্জিনিয়া ডোনাল্ড দম্পতিকে চিঠি লিখিলেন যে, তাঁহার যত্নে নাবালক খুব দ্রুত উন্নতি করিতেছেন। এমন কি, ইহার ভিতরে ব্রাহ্মণ ও পৌত্তলিকতায় তাঁহার এতটা ঘৃণা জন্মিয়াছে যে, সহসা সেই সুদূর পদ্মাতীরে একদিন খৃষ্টের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই রিপোর্ট পাইয়া কালেক্টর সাহেব দীনেন্দ্রকে অভিনন্দনপত্র লিখিলেন, এবং বোর্ডে লিখিয়া তাঁহার পড়া শুনার জন্য একজন ফিরিঙ্গী মাষ্টার আনাইয়া দিলেন। এই শিক্ষক ক্রমে বেশ দলে মিশিয়া গেল। তাহার ফলে পাশ্চাত্য বিদ্যায় ছাত্রের যে টুকু অসম্পূর্ণতা ছিল, অল্প দিনেই তাহা দুর হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাস্তবিক ইংরেজী শিক্ষা এবং সভ্যতার সেই প্রভাতে বাঙ্গালীর মানস-রাজ্যে যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে তাহার আলোচনায় লাভ আছে। জাতিগত স্বাধীনতা যতই উপাদেয় হউক না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্ত না হইলে, স্বাধীনতায় এবং অধীনতায় বড় একটা ইতর বিশেষ থাকে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনেক কাল আমাদের নাই, কিন্তু স্বানুবর্ত্তিতা কখন ছিল কি না সন্দেহ। সেই মানসিক অরাজকতা স্বানুবর্ত্তিতার নবীন উদ্বোধমাত্র।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গসমাজের একটা চিত্র দিতে আমরা প্রয়াস পাইতেছি। তখন রাজা রামমোহন রায়ের যুগ, নিশীথের ঘোরান্ধকার কাটিয়াছে বটে, কিন্তু প্রভাতের বিলম্ব আছে। সতীদাহপ্রথা উঠিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরে একদিন হিন্দু-কলেজের ছাত্রেরা তর্ক করিতেছিল, সে সম্পর্কীয় একটা সুলিখিত রিপোর্টের লেখক কে—রামমোহন কি আর কেহ? অধ্যাপক ডিরোজিও সকল শুনিয়া দুঃখে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা সব মানুষ না পাথর? দেশে অত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, কোথায় তার ফলাফল বিচার করিবে, না ব্যক্তিবিশেষের লিপিকুশলতার কথায় মাতিয়া আছ?" সেই নিশাশেষের শুকতারা কবি মধুসূদনের

প্রতিভা। তাঁহার জীবন এবং কাব্য উন্মেষোন্মুখ নবীন বাঙ্গালী জীবনের প্রথম চাঞ্চল্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। দেশীয় চিরন্তন প্রথা মাত্র তাঁহার চক্ষে অসহনীয়। তাই রামায়ণের রামচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্যে রক্ষঃবলীদলের পার্শ্বে সামান্য মনুষ্যমাত্র, এবং লজ্জানম্রমুখী বঙ্গরমণীর স্থলে বিদ্যুৎজ্বালাময়ী প্রগল্‌ভা দানবী প্রমীলার চিত্র, যার

"অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?"

শুনিয়া তখনকার যুবকদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল।

* * * *

জননী জন্মভূমি কুণ্ডলার চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়া দীনেন্দ্র অতঃপর গৃহিণীকে সভ্যা ভব্যা করিবার ভার স্বয়ং লইলেন। মিস্ ভার্জ্জিনিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও কুসুমমালার লজ্জা ভাঙ্গাইতে পারিলেন না—তিনি বলিতেন, "বউ, তোমার স্বামী পাশ্চাত্যজ্ঞানে শিক্ষিত, তোমাদের দেশী নির্বুদ্ধি লজ্জাশীলতা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? স্বামীর সাম্‌নে ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকা আর তাঁকে অপমান করা, একই কথা। ছি, এ সব ছাড়!" শুনিয়া কুসুম লজ্জা-নম্রমুখে ঈষৎ হাসিত—কখন নত নয়নে বস্ত্রাঞ্চলে অঙ্গুলি জড়াইয়া ক্রীড়ার ভাণ করিত—মেম্‌কে কিছু বলিত না। গোপনে সুরোকে বলিত, "আমি কি এমনি বেহায়া মেয়ে যে, মাথা খুলে শাশুড়ী, ননদ, চাকরাণীদের সামনে সোয়ামীর

সঙ্গে কথা কইব! মরণ কুবুদ্ধি আর কি! সে আমি পার্‌ব না। না হয় আর একটা বিয়ে করুক!”

দীনেন্দ্রের ইচ্ছা, তাঁর পত্নী মেমের মত লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া বেড়াইবে, তাঁর সঙ্গে চেয়ারে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া সকলের সমক্ষে হাস্য কৌতুক করিবে—সংক্ষেপে লজ্জা সরমের কোন ধার ধারিবে না। কিন্তু স্বামীর সে সব আদেশ শুনিলে কুসুম ভয়ে দুঃখে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইত, অনেক সময় এক গা ঘামিয়া উঠিত, এবং সাধারণতঃ “ঐ কে আস্‌চে” বলিয়া দেড় হাত ঘোমটাকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিত। দীনেন্দ্র প্রথম প্রথম ইহাতে আনন্দানুভব করিতেন, কিন্তু ক্রমে গরম হইয়া উঠিতে লাগিলেন। দেশ শুদ্ধ লোক তাঁর কথা শোনে, কত ব্রাহ্মণতনয় তাঁহার আজ্ঞায় মদ ধরিয়াছে, আর তাঁর নিজের ঘরের স্ত্রী কি না তাঁকে অবহেলা করে! প্রথম প্রথম দীনেন্দ্র মায়ের ভয়েও বটে, কতক স্ত্রীর প্রতি সম্ভ্রমবশতঃও বটে, মদ খাইয়া অন্দরে আসিত না। কিন্তু কুসুমের উপর চটিয়া গেলে সে সঙ্কোচ আর বড় রহিল না।

মত্তাবস্থায় দীনেন্দ্র কুসুমমালাকে গান গাহিতে বলিত—কুসুম কেবল কাঁদিত। দণ্ডস্বরূপ দীনেন্দ্র কোন কোন দিন তাঁহার বস্ত্রে মদ ঢালিয়া দিত, কখন বলিত, সমস্ত রাত্রি বসিয়া আমার পাখা কর। স্বামিসেবায় কুসুম সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইত। তাঁহার পথ্যাচার বিস্মৃত হইয়া সাধ্বী যে স্বামীর কল্যাণকামনায় মা দুর্গা জগদ্ধাত্রীকে ডাকিত

নীরবে চোখের জলে তার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত, অজ্ঞান দীনেন্দ্র তাহার কিছুই বুঝিতে পারিত না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামীর অত্যাচারের সকল কথা কুসুম সুরবালাকে বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু কিছু কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিত না। এ সংসারে যার সুখ দুঃখ ভাগ করিয়া লইবার লোক নাই, জীবনের ভার সে বহিতে পারে না। শুনিয়া শুনিয়া সুরো কুসুমমালার অশ্রুতে অশ্রু মিশাইত, এবং ভাবিত, প্রতীকারের কোন উপায় হইতে পারে কি না। কুসুম ভাবিত, চিরজীবন তাহার এমনি দুঃখে কষ্টে কাটিবে, সুরবালা ভাবিত, এ দুঃখ দূর করাই চাই। কুসুম যেখানে দেখিত কেবল আঁধার এবং বিষাদ, সুরো সেখানে দেখিত আলোক ও আনন্দ। দুই চরিত্রের পার্থক্য এইখানে। উভয়ের সখীত্ব কতকটা সুখ দুঃখের মিলনের মত।

মিস্ ভার্জ্জিনিয়া সুরো এবং কুসুমকে যেখানে পড়াইতেন, ইদানীং দীনেন্দ্র মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া দর্শন দিতেন। কুসুম মেমের সাম্‌নে ঘোম্‌টা টানিতে পারিত না বটে, কিন্তু জড়সড় হইয়া নত নয়নে বই মুখে করিয়া বসিয়া থাকিত।

সুরোর বেশ সপ্রতিভ ভাব। যে লজ্জা স্ত্রীচরিত্রের ভূষণ, তাহার অভাব নাই, অথচ তেজোগর্ব্বে এবং দৃঢ়তায় মিশিয়া আহা সুসংযত হইয়াছে। সুরবালার চলনে ফেরনে, প্রতি কোমল কটাক্ষপাতে এবং কথাবার্ত্তায় মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠিত, দীনেন্দ্র দেখিয়া প্রশংসমান চক্ষে তাহার সঙ্গে "বোন্‌টি" বলিয়া কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। সুরো দুএকটিমাত্র কথা কহিত, কেন না, ছেলেবেলা হইতে সে কখন "জেঠাই-মার" পুত্রটীকে দেখে নাই।

দীনেন্দ্র কুসুমকে অনুযোগ করিতেন, "বোনটীর মত হতে পার না?" কুসুম স্থির কোমল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া থাকিত, দীনেন্দ্র আবার বলিতেন, "বোনটী কেমন সপ্রতিভ, আমার সাম্‌নে তোমার মত জুজুমানা হয়ে বসে থাকে না। দু একদিন শুনিয়া কুসুম বলিল, "বোনটী ত আর তোমার বউ নয় যে, আমার মত জড়সড় হবে।" দীনেন্দ্র ভ্রু কুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, "বোনটীর মত তোমায় হতেই হবে।"

হাসিয়া কুসুম সে কথা সুরবালাকে বলিল, এবং "ওলো, তোকে তোর দাদার মনে ধরেচে" বলিয়া হাসিয়া অস্থির হইল। সুরো বিষাদের হাসি হাসিল, ভাবিল, তবে সে বউয়ের দুঃখ দূর করিতে পারিবে।

ইহার পর থেকে সুরো দাদার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অধিক কথা কহিত, এবং মেমের দ্বারা গল্প উঠাইয়া কুসুমকে স্বামীর

সমক্ষে হাস্য কৌতুকে যোগ দিতে অভ্যস্ত করাইত। কুসুম হাসিত বটে, কিন্তু তাহা অধরে ফুটিয়া গণ্ডে মিশাইত,—ঐ পর্য্যন্ত। মেমসাহেবের সম্মুখে, ননদের সম্মুখেও বটে, সে নিঃসঙ্কোচে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবে? ধিক্! তার কি দড়ি কলসী জোটে না!

সুরবালা বলিত, "বউ অত লজ্জা ক'রে সব খোয়াবি,—আর কাকেই বা লজ্জা করিস্? মেম তোর লজ্জা দেখে হাসে, আর বলে, 'ও একটা জন্তু'। সত্যিই ত, লেখা পড়া শিখ্‌চিস্, তুই একটু তাঁর মন জুগিয়ে চল্‌লে দাদা যদিই ভাল হন, সে চেষ্টা না করিস্ কেন?" কুসুমমালা সম্মত হইল, সুরোর সুমুখে সে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবে, কিন্তু মেমের সুমুখে নহে। আর ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া সে কথা কহিবে, জনপ্রাণী তাহা শুনিতে না পায়।

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিয়া সুরো বলিল, "জেঠাইমা, কলিকাতায় গিয়ে দাদার মরজি হয়েচে সাহেবের মত, তাঁর ইচ্ছে বউ মেমদের মত তাঁর সঙ্গে একত্র খায় দায় বেড়ায়—বুঝেচো? বউ লজ্জায় মরে আর কাঁদে, তুমি বাপু এর একটা ব্যবস্থা কর।" হরিপ্রিয়া সুরোকে কোলের কাছে বসাইয়া আদরে তাহার হাস্যপ্রফুল্ল সরল মুখখানি দেখিতেছিলেন, মিতিনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন—"দেখেচো, মুখখানি হয়েছে ঠিক্ যেন ছোট বউয়ের মতন। আহা, দুই সরিকে তখন অত বিবাদ, তবু ছোট বউয়ের ভাল-

বাসা আমার উপর একদিনের তরে কমেনি। লুকিয়ে লুকিয়ে কত মিষ্টি কামরাঙ্গা আর বেতোর শাক পাঠাত। কপালে নেই, এমন মেয়ে নিয়ে ঘর করতে পেলে না।” সুরবালার কথা শুনিয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন—“কুকি, ঐটেই সুধু বাকী, নইলে কোকন যে-সব অনাচার নিয়ে থাকে, ভয় হয়, পাছে রাধাগোবিন্দ কোপ করেন। আমার একটি ছেলে, কত পূজা স্বস্তেন করলাম কুকি, কিছুতেই কিছু হয় না। কোকনের ভয়ে দৈবজ্ঞিরেও আর আসতে চায় না—কে নাকি টীকি কেটে মদ খাইয়ে দিয়েছিল। দেবতা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবারই কাছে অপরাধ, কপালে কি আছে জানিনে।” হরিপ্রিয়া সুরবালার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া বিহ্বল বিবশ হইয়া রোদন করিলেন।

সুরো দেখিল, জেঠাইমার দ্বারা কিছু হইবে না—মাঝথান থেকে কথা উঠিবে, মেম্ সাজিতে তবে বউয়েরই সাধ হইয়াছে। সুরবালা প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে চাহিলে কর্ত্রী বলিলেন, “কুকি, একটা কথা শোন মা! কালেক্টের সাহেবের মেমের ইচ্ছা তোমার যেন বিয়ে হয়, আমায় সে দিন দেখা করে তাই বলতে এসেছিলেন। আমি জিব কেটে বললাম, ‘মেম সাহেব, আমার কোকন বয়ে গিয়েছে সয়েচে, কুকীর বিয়ে দিয়ে মৈত্রকুলে কালি দিও না।’ কুকি, তুই আর লেকা পড়া করিস্‌নে মা—ওরা সব মায়াবিনী।” সুরো একমুখ হাসিয়া বলিল, “সে ভয় করো না জেঠাইমা

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সাধারণতঃ বাঙ্গালীর মেয়ের "ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ," অতএব তাঁহাদের দয়া মায়া সচরাচর যে গৃহপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে না, ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। বঙ্গকুললক্ষ্মীদের লজ্জানম্র মুখ, অবগুণ্ঠনের পবিত্রতার ভিতর যেমন মানায়, বড় কথায় এবং বৃহৎ ভাবে তেমন নহে। সেই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গিয়া দীনবন্ধু বাবু বলিয়াছিলেন, "পুরুষ জ্যাঠা সওয়া যায়, মেয়ে জ্যাঠা সওয়া যায় না।"

সুরবালাকে আমরা কতকটা সেই মেয়ে জ্যাঠার দলে ফেলিতে বসিয়াছি। চিত্রটা যাঁদের কটু লাগিবে, ভরসা করি তাঁহারা মনে রাখিবেন, আবাল্য সুরোর শিক্ষা দীক্ষা বঙ্গ-রমণীর চিরক্ষুণ্ণ পথে চালিত হয় নাই। বার বছর বয়সে সে জানিল, এ জীবন বৈধব্যের কঠোরতায় অভ্যস্ত করাই ধর্ম্ম, খানিকটা অসাধারণত্ব তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুরো বুঝিল, আপনার সুখে দুঃখে যে তন্ময়, ব্রহ্মচর্য্য তাহার জন্য নহে। মেমেদের সহবাস এবং শিক্ষায় তাহার মনের সেই ভাব ক্রমে বিকসিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, মিস্ ডোনাল্ডের মত সম্ভ্রান্ত বিদেশিনী রমণী জাতি ধর্ম্ম ভুলিয়া, আপনা ভুলিয়া, তাহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহ

করেন। দেখিল, মিস্ ভার্জ্জিনিয়া বিবাহ না করিয়াও বেশ সুখী এবং আপনার ধর্ম্মে মতি রাখিয়া পরহিতকামনায় তিনি যে দীর্ঘ জীবনপথ অতিবাহিত করিতে চান, ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। অতএব অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিবার অনেক পূর্ব্বে সুরবালা আজীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল।

মিসেস ডোনাল্ড আগে যখন তখন অনুরোধ করিতেন—"সুরো, অবশ্যই তুমি মনোমত পতিকে বিবাহ ক'রে আমায় সুখী করিবে।" প্রথম কয় বছর সুরবালা সে কথায় কেবল অপ্রতিভের হাসি হাসিত, কোন উত্তর দিত না। শেষে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে বলিত,—"বিবাহই কি এত সুখের? তা হ'লে আপনাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক চির-কুমারী থাকেন কেন?" ভার্জ্জিনিয়া হাসিয়া বলিতেন, "সুরো, তোমার মত যার ধন সম্পত্তি আছে, চিরকৌমার্য্য তার জন্য নহে।" ইহাতে গম্ভীর হইয়া সুরবালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত, বলিত, "আমি অন্যপূর্ব্বা, বিধবাতে আমাতে তফাৎ নেই। বিবাহের কথা শুন্‌লেও আমার পাপ আছে।" বিবাহের কথায় সুরবালা এইরূপ জেঠীমা সাজিয়া বসিত বটে, কিন্তু আর সব ব্যাপারেই তাহার ছেলে বেলার সেই আনন্দ উৎসাহ এবং অভিমানের ভাবটা অক্ষুণ্ণ ছিল। মিসেস্ ডোনাল্ড ভগীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আন্না, কই তোমার সুরোকে ত কিছুতেই বিবাহে রাজি কর্‌তে পারনে, তুমি

একবার চেষ্টা করে দেখো।" ভগী দাসী চোকের জল ফেলিতে ফেলিতে একদিন বলিল, "সুরো,আমার চির দিনের সাধ যে, বুড়ো বয়সে তোমার ছেলেপুলে মানুষ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে চোক বুজি। তুমি এত জ্ঞানমান হয়েচো, বিয়ের যখন চলন আছে, তখন দোষ কি ?" সুরো সে দিন ভগী বেটীর কথায় কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া ছেলে বেলার মত রাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং অভিমানভরে দুই এক দিন আহার করে নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, "তুই কোথায় আমায় ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি দিবি, তা নয় চির কাল এক কথা। আজ জমাদার থাক্‌লে এমন কথা কি তুই বল্‌তে পার্‌তিস ?" রাগের কথা শুনিয়া কুসুমমালা বলিল, "ছি ঠাকুরঝি, বুড়ো মানুষ, তোমায় মানুষ করেচে, ওর কি সাধ হয় না যে তুমি সংসারী হও।" সুরো অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিল,—"বউ, ভগী বেটীর কাছে আমার মনে হয় সেই আমি ছেলে মানুষ। কিন্তু ভাগ্যিস্ ছেলে বেলার মত কিল্‌টে চাপড়টা ধরিয়ে দিইনি। কিন্তু তা হ'লেও ও কিছু মনে কর্‌তো না।"

এই সময়ে একদিন এক খানা ময়লা ব্যারিং চিঠি সুরবালার নামে আসিয়া উপস্থিত। লেখাটা হিন্দী বটে, কিন্তু এবারৎ হিন্দী বাঙ্গালা মিশ্রিত। লেখক অকালী সিং স্বয়ং— আজও সে সুরোদিদিকে দেখিবার জন্য বাঁচিয়া আছে! সুরোর সাবালিকা হইতে এখনও প্রায় দেড় বৎসর বাকী—

ততদিন সে কি বাঁচিবে! কিন্তু সে প্রতিশ্রুত আছে, তার আগে কুণ্ডলায় আসিবে না। পত্র শুনিয়া সুরো বিবশ, বিহ্বল বালিকার মত কাঁদিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

জেঠাইমা হাসিয়া কাঁদিয়া সুরবালাকে বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তার পর সে ভাব আর রহিল না। মিতিনকে বলিলেন, "দেখ্‌লে, আমি যে বলি নেকা পড়া শিখে বউটা একেবারে নিঃসঙ্কোচ হবে, সেটা ফল্‌চে কি না? আমার কোকনকে পোড়ার মুখো সাহেব গুলো মদ মাংস খাইয়ে মন্দ করেচে, নইলে বাছা আমার ছেলে মানুষ বই ত নয়, ভাল মন্দ কিছুই জানে না। মেমেদের দেখাদেখি বউমার ইচ্ছে হ'য়েচে মেম হ'তে, তাই সুরোকে মাঝখানে রেখে কথা চালাচালি করা হচ্ছে। সাধে কি ছেলে বউটোকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না?" মিতিন ঠাকুরাণী কর্ত্রীর কাছে সরফরাজ হইবার ভরসায় প্রায় তদ্দণ্ডে বধূমাতার প্রকোষ্ঠে হাজির হইলেন। কুসুম বরেন্দ্রভূমিসম্মত প্রথামত শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সঙ্গে ঘোমটার ভিতর থেকে তুড়ি দিয়া কথা কয়, মুখ খুলিয়া বাক্যে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা সনাতন প্রথার বিরুদ্ধ। শাশুড়ীর মিতিন চৌদ্দ আনা শাশুড়ী, বধূর কাছ থেকে

সে মূক সম্মান টুকু তাঁরও প্রাপ্য বটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটু ব্যাতিক্রমস্থল ছিল। মিতিন মানদাসুন্দরী কুসুমের পিত্রালয়ের অদূরে বাস করেন।

মানদা এক মুখ হাসিয়া একটু ব্যঙ্গ স্বরে বলিলেন, "কি গো বড় মানুষের বেটী—তুমি নাকি মেমসাহেবকে মা ব'লে তার প্রসাদ খেয়েচো। শু'নে তোমার শাশুড়ী মাথা মুড় খুঁড়চেন যে।" কুসুম জানিত, মিতিন ঠাক্‌রুণ বড় রঙ্গপ্রিয় এবং হাস্যরসের অনুরোধে সকল কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বলা তাঁর রীতি। হাসিয়া বলিল, "মেমসাহেবের সঙ্গে বড় শাশুড়ীর সম্বন্ধ ধরি গো মিতিনমা! ঠাক্‌রুণকে ব'লো, তা হ'লে আর রাগ করবেন না।" কিন্তু কুসুম যখন মানদা-সুন্দরীর কাছে শুনিল, সুরবালার কথায় কর্ত্রী ঠাকুরাণী বুঝিয়াছেন সব দোষ তাহারই, তখন সে কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিল।

মানদা দেবী বলিলেন, "কুসুম, তোমার শাশুড়ির মিতিন হয়েছি বলেই যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক, তা নয়। আজও তোমার বাপ ছেলেবেলার সম্বন্ধ ধ'রে দিদি দিদি ক'রে বাঁচেন না। একটি কথা বলি মা, সেই জন্যেই তোর কাছে এসেছি।" মানদা দেবী এদিক ওদিক চাহিয়া দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া আসিলেন, কুসুম ভয়ে শুকাইয়া উঠিল।

মিতিন ঠাকুরাণী চুপি চুপি বলিয়া চলিলেন, "দাসী-দের ভিতর কানাঘুষো উঠেচে, মেমের কাছে পড়্‌তে

গিয়ে তোরা দুজনে বিলেতী খানা খাস, আজ কাল আবার কোকা গিয়ে তোদের সঙ্গে মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে। বিনোদা বলে যে, ছোট বাড়ীর কুকীর যে রকম চাল্ চলন হয়ে উঠেচে শীগ্‌গির একটা সাহেব বিয়ে কর্‌লে ব'লে! তোমার শাশুড়ীর কাঁনে এ সব কথা আজও ওঠেনি; একেই চ'টে আগুন, এ সব শুন্‌লে সে পদ্মায় ঝাঁপ দেবে। তুই বাছা নেকাপড়া ছাড়। আর ছোট বাড়ীর কুকীর সঙ্গে অত ভাবও রাখিস্‌নে।" স্তম্ভিত হইয়া কুসুম এ কথা গুলি শুনিল। নিন্দার ভয়ে একেই সে বাঁচে না, তার উপর কি বিষম কলঙ্ক! বিলেতী খানা খায়! সোয়ামীর সঙ্গে মদ খায়! কুসুম জানিত, সুরবালা এ সব শুনিলে হাসিয়া উড়াইবে, কিন্তু তার পক্ষে মেমের কাছে বসিয়া স্বামীর সমক্ষে লেখাপড়া করা অসম্ভব। না হয় ইহ জীবনে স্বামি-প্রেম তাহার কপালে ঘটিবে না—লোকলজ্জা বেশী, কি একটু পুতুলের আদর বেশী! দীনেন্দ্র ভাল নাই বাসুক, কুসুম তাঁহার পদসেবা করিয়াই সুখী হইবে!

কুসুম প্রতিশ্রুত হইল, আর সে মেমের কাছে পড়িতে যাইবে না, এবং যথাসাধ্য সুরবালার সংসর্গ ত্যাগ করিবে। শেষ কথাটা মনে করিতেও তার মর্ম্মগ্রন্থিতে দারুণ আঘাত লাগিল—কেন না, সুরোর ভালবাসা ছাড়া জীবনে তার অন্য সুখ বড় ছিল না। কুসুম ভাবিল, আগেকার মত দেখা শুনা না হইলেই কি তাদের ভালবাসা কমিবে!

সুরবালা ঠিক্ এই সময়ে ভাবিতেছিল, যেমন করিয়াই হোক্, সে কুসুমকে স্বামীর মনের মত করিবে। একবার মনে হইতেছিল, দীনেন্দ্রের মত মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খলচরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা তাহার পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু কুসুমের দীন সজল চক্ষু মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে কথা সুরো মনে ঠাঁই দিল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুসুমমালা আর মেমের কাছে পড়িতে যায় না; দুই দিন এই ভাবে গেল। মেম্ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে পরিচারিকারা বলে, তাঁর অসুখ করিয়াছে। তিন দিনের দিন দীনেন্দ্র মেমের কাছে সে কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কেন না, পীড়ার কোন কথা তিনি আদৌ জানিতেন না। ইহা কি সম্ভব যে, কুসুম তাঁহার কাছে তাহা গোপন করিয়াছে? দীনেন্দ্র মেম্সাহেবের নিকট একটু অপ্রতিভ হইলেন। দিনের বেলায় অন্দরে গিয়া স্ত্রীসম্ভাষণ মাতার ও পুরপরিজনবর্গের চক্ষে মহাপাতকস্বরূপ গণ্য হইলেও, দীনেন্দ্র বেলা আড়াই প্রহরের সময় অকস্মাৎ শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। কুসুম তখন মিতিনমার সঙ্গে সুখ দুঃখের গল্পে ভোর ছিল। মানদা ঠাকুরাণী আশঙ্কা করিতেছিলেন, পীড়ার ভাণ করিয়া কুসুমের ক' দিন চলিবে? পড়িতে না গেলে মেম্ কালেক্টরের

কাছে অবশ্য রিপোর্ট করিবে। তখন? তখন কোকার সঙ্গে তাকে সদরে গিয়া মেম্ সাজিতেই হবে! কালেক্টর সাহেবকে বলিতে হবে বাপ, এবং টেবিলে খানা খেতে হবে! বলা বাহুল্য, কথা এর বেশী নয়, কিন্তু মিতিনমার হাস্যসূত্রে প্রসঙ্গ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। অতএব অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে কোকা যে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, সেটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কুসুমকে অকস্মাৎ কচ্ছপের মত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখ লুকাইতে দেখিয়া অনাবৃত মস্তক এবং বক্ষোদেশ মানদা দেবী ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ! কোথায় যাব মা! দিনের বেলায় এ যে কোকন! কোনমতে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া ঠাকুরাণী ঊর্দ্ধশ্বাসে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। দীনেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "অত দৌড়ে যেয়ো না মিতিনমা! প'ড়ে যাবে যে।" সে কথা ঠাকুরাণী কাণে তুলিলেন না।

বলা বাহুল্য, অন্দর মহলে সে দিন হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মৈত্রবংশের কেহ কখন পিতৃত্বলাভের পূর্ব্বে স্ত্রীর সঙ্গে দিবা-ভাগে সাক্ষাৎ করেন নাই। কোকন হইতে এই চিরন্তন প্রথা উঠিতে চলিল, ইহা কি সহিবে? কর্ত্রীঠাকুরাণী যত কাঁদেন, তাঁর মিতিন এবং পরিচারিকারা তত এই কথারই আলোচনা করে। শেষে হরিপ্রিয়া পরামর্শ করিলেন, কাল থেকে বউ-মাকে নূতন বাড়ীতে রাখিয়া দিবেন, নইলে পুরাতন অন্দরে দম্পতির দিবামিলনপাপ কিছুতেই কাটিবে না।

দীনেন্দ্র বুঝিলেন, কুসুমের অসুখের কথাটা ভাণ মাত্র—ভিতরে বিশেষ কিছু কথা আছে। কিন্তু কিছুতে কুসুম তাহা ভাঙ্গিল না। দিনের বেলায় সে ভাবে শয়নগৃহে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া সে লজ্জায় মরিয়া গেল। দীনেন্দ্র যতক্ষণ ছিলেন, পত্নীকে কেবল চোখের জল ফেলিতে দেখিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর রোদনের স্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কুসুম স্বামীকে বলিল, দিনের বেলায় নিঃসঙ্কোচ হ'য়ে আসা কেবল তাহার যন্ত্রণাবৃদ্ধির জন্য। মরণ হলে বাঁচি। ইত্যাদি! আসল কথাটা ঠিক্ না বুঝিলেও দীনেন্দ্র আন্দাজ করিলেন, মায়েতে আর মিতিনমাতে এই অসুখের ভাণ-মূলে বিরাজ করিতেছেন। মিতিনমার সমালোচনা দীনেন্দ্র স্বকর্ণে একটু একটু শুনিয়াছিলেন—অতএব পোষক প্রমাণের তেমন অভাব হইল না। রোষে, অভিমানে দীনেন্দ্রনাথ অন্দর মহল ত্যাগ করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাহিরে আসিয়াই দীনেন্দ্র ডোনাল্ড সাহেবের এক সুদীর্ঘ চিঠি পাইলেন। চিঠি খানির আগাগোড়া সুরবালার কথায় পূর্ণ। সাহেবদম্পতি সেই নাবালিকাকে কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া পাশ্চাত্যজ্ঞানে দীক্ষিত করিয়াছেন, বরাবর তাঁহাদের ভরসা ছিল, সে দেশীয় কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া যথা-

সময়ে উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হইবে। কিন্তু সে আশায় তাঁহারা নিরাশ হইতে বসিয়াছেন। এখন এমন কোন উপায় কি হইতে পারে না, যাহাতে বালিকার মন ফিরিতে পারে? মিসেস্ ডোনাল্ড বিধিমতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন বটে, কিন্তু সাহেবের বিশ্বাস, দীনেন্দ্রনাথ একটু যত্ন করিলে এখনও সুফল ফলিতে পারে। এই গৌরচন্দ্রিকার পর ডোনাল্ড নিজে হইতে একটা উপায় নির্দ্ধারণ এবং সে সম্বন্ধে দীনেন্দ্রের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। চিঠির শেষ ভাগটায় দীনেন্দ্রকে জ্বলন্ত ভাষায় খুব উৎসাহিত করা হইয়াছে।

বছর দুই কুণ্ডলায় থাকিয়া দীনেন্দ্র সুধুই যে সুরাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ধীরে ধীরে তাঁহার মনে একটা বিপ্লব ঘটিতেছিল। গৃহিণীর কোমল সুরভিময় চরিত্র তাঁহার হৃদয় তেমন স্পর্শ করিতে পারিত না বটে, কিন্তু মিস্ ভার্জ্জিনিয়াকে সমিহ করিয়া চলিতে হইত, এবং সুরবালার প্রতি পদক্ষেপে তিনি একটা মহত্ত্ব অনুভব করিতেন। কুসুমকে তিরস্কার করিয়া দীনেন্দ্র যখন বলিতেন,—"বোনটির মত হ'তে পার না," তখন তাঁহার নিজেরই মনে হইত, তাঁর চেয়ে সুরবালা কত মহৎ! মিস্ ভার্জ্জিনিয়া দীনেন্দ্রকে যে মূর্ত্তিতে চিত্রিত করিয়া ডোনাল্ডদম্পতির চক্ষের সাম্নে ধরিতেন, আসলে কিন্তু তিনি তাহা ছিলেন না। কিন্তু ক্রমে সে আদর্শে উঠিতে তাঁহার আন্তরিক বাসনা হইল। তার উপর সুরবালার অমায়িক ভাব, বাক্যে কার্য্যে মহত্ত্বের ভাব, কি মহান্

আদর্শ! ইদানীং কুসুমমালা দেখিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইত যে, স্বামী তাহাকে "মেম" করিতে জেদ্ করেন বটে, কিন্তু আগেকার মত দুর্ব্যবহার কিছু করেন না। অধিক কি, কিছু দিন হইতে শয়নকক্ষে মদের বোতল আসা বন্ধ হইয়াছিল।

কালেক্টর সাহেবের চিঠি পাইয়া দীনেন্দ্র অতিশয় উল্লাসিত হইলেন। রাগান্ধ হইয়া পত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্মিতমুখে তাহা শেষ করিলেন। "বোনটির" জীবন যাহাতে সুখী হয়, সে জন্য বিদেশী লোকদের তত আগ্রহ, আর তিনি এত দিন কোন চেষ্টাই করেন নাই! কুসুমের সাহায্যে তিনি কি সুরোর মন ফিরাইতে পারিবেন না? অবশ্য পারিবেন। তখন গৃহিণীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া গেল। দীনেন্দ্রনাথ আবার শয়নকক্ষের উদ্দেশে ছুটিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরবালা সচরাচর বড় তরফের অন্দর বাড়ীতে আসিত না। বউর সঙ্গে রোজ তাহাদের ইস্কুলগৃহে যে কয় ঘণ্টা মিলন হইত, পড়া শুনা এবং গল্প স্বল্পের জন্য তাহাই যথেষ্ট। একটু চেষ্টা করিলে তাহার উপরও প্রাতে সন্ধ্যায় তাহারা উভয়ে একত্রিত হইতে পারিত বটে, কিন্তু ইহাতে নানা বিঘ্ন। সুরো

আসিলে কর্ত্রী ঠাকুরাণী খুব আদর যত্ন করেন বটে, কিন্তু শুচিবায়ুর প্ররোচনায় সে পাল্‌কীতে উঠিতে না উঠিতে তাঁহার স্নান না করিলে চলে না। সেই ভয়ে কুসুমও মেয়ের কাছ থেকে ফিরিয়া শাশুড়ীর কাছে বড় ঘেঁষিত না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে সুরবালা জেঠাইমাকে প্রণাম করিতে আসিত না।

সেই জন্য কুসুমের অসুখের কথা শুনিয়াও প্রথম দুই দিন সুরবালা দাসীদের দ্বারা খবরাখবর লইয়াই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু তিন দিনের দিন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ইস্কুলে আসিয়া একটু সকাল সকাল পড়াশুনা শেষ করিয়া সুরবালা মেয়ের কাছে বিদায় হইল। দীনেন্দ্র-নাথের শয়নকক্ষত্যাগের অব্যবহিত পরেই সুরো বউর ঘরে দর্শন দিল। কুসুম তখনও আঁচলে মুখ ঝাঁপিয়া রোদন করিতেছিল। তাহার অসংযমিত কেশপাশ তখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই। সুরো স্পর্শ করিয়াই বুঝিল, অসুখের কথাটা ভান মাত্র।

সুরবালার আগমনবার্ত্তা যখন কর্ত্রীঠাকুরাণীর প্রকোষ্ঠে পৌঁছিল, বধূকে নূতন বাটীতে নির্ব্বাসনের পরামর্শ তখন স্থির হইয়া গিয়াছে। তবে বিচার হইতেছিল, কালই তাহা কার্য্যে পরিণত করা ভাল, কি একটা দিন ক্ষণ দেখান কর্ত্তব্য? এমন সময়ে বিনোদা দাসী মিতিনমার কানে কানে সুরবালার নামমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই শান্তপ্রায় রমণীসমাজ আবার

উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। দাসীদের উচ্চ কলকণ্ঠ অকস্মাৎ ফুস্‌ফুস্ কথায় নামিয়া আসিল। রাগ এবং অভিমানের স্থলে ভয় এবং বিস্ময় আসিয়া হরিপ্রিয়া দেবীর হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া বসিল। তাঁহার মনে হইল, মেমসাহেবের রিপোর্ট পাইয়া কালেক্টর সাহেব নিশ্চয়ই একটা কড়া রকমের হুকুম দিয়াছে। নইলে কোকাই বা কেন অমন করিয়া আসিবে, আর কুকীই বা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জুটিবে কেন? হরিপ্রিয়া দেবী ভয়ে শুকাইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর মিতিনঠাকুরাণী দেরিমাত্র না করিয়া বিনোদাকে শিখাইয়া দিলেন যে,সে গিয়া বধূমাতার ঘরে দাঁড়াইয়া থাকে। বিনোদা দ্বার পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে মানদাদেবী আবার তাহাকে ডাকিলেন, এবং মিতিনকে চোক টিপিয়া কতক কথায় কতক বা ইসারায় বলিলেন, "যতক্ষণ আমি না যাই ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বি; কথাবার্ত্তা যা হয়, শুন্‌বি—বুজ্‌লি?" বিনোদা একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া প্রায় ছুটিয়া চলিল। তার হাসির অর্থ—"ঠাক্‌রুণ, এমন কাজ রোজ আমরা করে থাকি!"

ততক্ষণ কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছিল, এবং ঠাকুরঝির হাত থেকে আর্দ্র চুলের গেছা কাড়িয়া লইয়া কাপড়ের অন্তরালে সেগুলি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মনের কথা কিছু বলিবে না, এইরূপ স্থির করিয়াছিল বটে, কিন্তু সুরোর হাসি, আদর আর প্রশান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার সমস্ত দৃঢ়তা এলাইয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে বিনোদা দাসী

দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। এবং একটু পরে হাসি মুখে স্বয়ং মানদাঠাকুরাণী হেলিতে দুলিতে আসিয়া জুটিলেন। সহজেই সুরো বুঝিল, বউতে আর তাতে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা হয়, জেঠাইমা এবং তাঁহার সহচরীদের সে ইচ্ছা নহে। এই চক্রান্তে আর কোন মেয়ে হইলে হয় ত পলায়ন স্থির করিত, কিন্তু সুরবালার কৌতূহল ইহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সুরো ইংরাজী বেশ বলিতে কহিতে শিখিয়াছিল। কুসুম তেমন বলিতে না পারুক, বলিলে বেশ বুঝিতে পারিত। অতএব সুরোর ভারি ইচ্ছা হইতেছিল, ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহাদের মতলবটা ব্যর্থ করিয়া দেয়। কিন্তু জেঠাইমার তুল্য পূজনীয়া মিতিনমার সামনে সেটা কি ভাল দেখাইবে? সুরোর ভারি লজ্জা করিতেছিল। যাহাই হোক, সুরোর মনে কোনও খল কপট ছিল না। স্পষ্ট কথা বলিতে কখন ইতস্তত: করিত না। এবং এমন স্নেহকোমলভাবে তাহা বলিত যে, কেহ তাহাতে কখন মর্ম্মে আঘাত পাইত না। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাহার সেই মধুর কোমল স্পষ্টবাদিতা সকলের উপর জয়লাভ করিল। মিতিনমার সঙ্গে খানিকটা গল্প করিয়াই সুরো হাসিয়া বলিল, "মিতিনমা! জেঠাইমার কাছে একটু পরে যাব। বৌএর সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে। তোমার সামনে বল্‌তে পারবো না। আমাদের দুই জনকে বাপু একটু একলা থাক্‌তে দিতে হবে।" এ কথায় কুসুম নিজের বধূত্ব ভুলিয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ-

হাস্ত করিল, এবং মানদাঠাকুরুণ একেবারে মাটি হইয়া গেলেন। "তা বেশ ত মা, বেশ ত!" আমি উঠে যাচ্চি বলিতে বলিতে ঠাকুরাণী মহা ব্যস্তভাবে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বলা বাহুল্য, তখন নির্জ্জন পাইয়া সুরো একে একে কুসুমের সব কথাই শুনিল। কুসুম ভাবিয়াছিল, সব কথাই গোপন করিবে, কিন্তু ঠাকুরঝির কাছে কবে সে জিতিতে পারে? তার উপর সে যা ভাবিয়াছিল, তাই ঘটিল,—তার মনের কথা শুনিয়া সুরো হাসিয়া হাসিয়া অস্থির হইল। কুসুম মহা অপ্রতিভ হইয়া গেল। এমন সময়ে দীনেন্দ্র আবার নিঃশব্দপদসঞ্চারে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই জনের মনের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন, তাহাদের অকৃত্রিম সখীত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। দাদাকে দেখিয়া সুরবালা একটু ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল,—বউ আবার মুখ ভার করিলেন। "আচ্ছা বোনটি, তোমরা বস, আমি আর যাব না," বলিয়া দীনেন্দ্র বহির্ব্বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ডোনাল্ড সাহেব মিস্ ভার্জ্জিনিয়াকেও এক চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহারও বিষয় অবশ্য সুরবালার বিবাহ, এবং যে পরামর্শ দীনেন্দ্রের চিঠিতে ইঙ্গিতমাত্র, ইহাতে তাহা স্পষ্টী-

কৃত হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বার অন্দর মহল হইতে ফিরিয়া আসিয়াই দীনেন্দ্র শিক্ষয়িত্রীর এক আহ্বানপত্র পাইলেন। বলা বাহুল্য, তিনি ভারি দরকারের ধুয়া তুলিয়া অবিলম্বে দর্শন-ভিক্ষা করিয়াছেন।

সেই দিন অপরাহ্নে মিস্ ভার্জ্জিনিয়াতে এবং দীনেন্দ্রনাথে অনেকক্ষণ বসিয়া সুরবালা ও কুসুমের কথা হইল। এক্ষণে আমরা তাহার সবিশেষ পরিচয় দিব না। দীনেন্দ্র পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঐই আলোচনার ফলে তাঁহাকে আপাততঃ সে সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল।

অতএব রজনীতে কুসুমের সঙ্গে দেখা হইলে রোদন ও অভিমানাধ্যায় শেষ করিয়া, সে যখন দিবা-ব্যাপারের কারণ বারংবার জিজ্ঞাসা করিল, দীনেন্দ্র তখন আসল কথা বলিতে পারিলেন না। হাস্যপরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিতে হইল যে, মিছামিছি স্কুল কামাই করিয়া কুসুম ভারি একটা বিপদ আনিয়া ফেলিয়াছে। কালেক্টর সাহেব চিঠি দিয়াছেন, এখন থেকে সে আর অন্দর মহলে মার কাছে লুকাইয়া থাকিতে পাইবে না, মেমের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইবে! কুসুম অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখিল না। স্বামীর হাস্যপ্রফুল্ল মুখে চোখে রহস্য-ভাবের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও সে বুঝিতে পারিল না যে, কথাটা তামাসামাত্র।

প্রায় শুকাইয়া উঠিয়া কুসুম স্বামীর হাতে হাত রাখিয়া বলিল, "এখন উপায়?"

দীনেন্দ্র কষ্টে উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিলেন। মুখ ভার করিয়া উত্তর দিলেন, "উপায় কিছু নেই। আমি ত ভেবে পাইনে। মেম্ সাহেবের কাছে কাল থেকে তোমায় বাস করতেই হবে!"

কুসুম কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "এর চেয়ে ঠাকুরুণের কথা ঢের ভাল। মিতিনমা সন্ধ্যার সময় বলে গেলেন, এ বাড়ীতে দিনের বেলায় পুরুষদের আসা যাওয়া কোন কালে ছিল না। তুমি যে আজ দু বার এসেছো, এটা ভারি অ-লক্ষণ। মা তাই ঠিক করেচেন, আমাকে নতুন বাড়ীতে একলা রেখে দিবেন। শুনে অবধি আমার মরতে ইচ্ছে করচে। বউ মানুষ আমি কি একলা থাকতে পারি গা, আর শাশুড়ীর কাছ ছেড়ে থাকা কি ভাল দেখায়? কত অখ্যাত হবে! মরণ হলে বাঁচি। কিন্তু মেমের কাছে থাকার চেয়ে নতুন বাড়ীতে থাকা ঢের ভাল,—ধর্ম্ম ত রক্ষে হবে!"

এই কথায় দীনেন্দ্র তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধির একটা পথ দেখিতে পাইলেন। অপরাহ্ণে মিস ভার্জ্জিনিয়ার সঙ্গে তাঁহার যে পরামর্শ হইয়াছিল, দেখিলেন, স্বতঃই তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত, দু জনে রাত দিন একলা একলা থাকবো, এ তো সুখের কথা। মারু আচারের জ্বালায় বোনটিতে তোমাতে সর্ব্বদা দেখা

শুনা হয় না, নতুন বাড়ীতে সে ভয় থাকবে না। যে পর্য্যন্ত মা তোমায় সেখানে না পাঠান, আমি দিনের বেলায় তোমার মহলে যাওয়া ছাড়বো না। দু বার গিয়ে এই হয়েচে, কাল থেকে বার বার যাব।”

শেষের কথা কটা বলিতে বলিতে দীনেন্দ্র কিছু উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একটু কালাপাহাড়ী ভাব ছিল, যাহা কুসংস্কার এবং যুক্তিহীন বলিয়া বুঝিতেন, সহজে তার নিস্তার ছিল না। এ সব বিষয়ে স্বামীর যে কথা, সেই কাজ, কুসুমের তাহা জানা ছিল, এবং সে জন্য সে অনেক সময়ে তাঁহাকে “নিঃসঙ্কোচ” বলিয়া অনুযোগও করিত। আজ কিছু বাড়াবাড়ির লক্ষণ দেখিয়া কাঁদিতে বসিল।

হাসিয়া দীনেন্দ্র স্বীকার করিলেন যে, বেশ, তিনি আর দিনের বেলায় কুসুমের মহলে যাবেন না, কিন্তু এই সর্ত্তে যে, নূতন বাড়ীতে আসিতে সে আর কোন আপত্তি করিবে না। নহিলে মিস্ ভার্জ্জিনিয়ার গৃহে বসবাস অনিবার্য্য। কুসুম নীরবে সম্মত হইল। তার পর তার কান্না ভাল হইয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইহার কিছু দিন পরে ডোনাল্ড দম্পতির নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া দীনেন্দ্রনাথ একবার সদরে গেলেন। উভয়ে কলিকাতাবাসী

এক জমীদারতনয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। এই যুবক অসিতনাথ। ইনি সম্প্রতি জমীদারী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন,এবং কলিকাতা হইতে ডোনাল্ড সাহেবের নামে পদস্থ কর্ম্মচারীদের পরিচয়পত্র আনিয়া অল্প দিন মধ্যেই সাহেব দম্পতির বেশ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

প্রথমে দীনেন্দ্রনাথ এবং অসিতনাথ কেহই পরস্পরকে চিনিতে পারেন নাই। সাহেবের কাছে পরিচয়ের অবসরে উভয়ে উভয়ের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তথন কেহ কিছু বলিলেন না। দু জনেরই ভারি লজ্জা করিতে-ছিল। নানা কথার উপর ডোনাল্ড বরেন্দ্রভূমিতে জমীদারীর সুশাসন জন্য অসিতনাথের সাধুবাদ করিয়া দীনেন্দ্রকে উপ-দেশ দিলেন, তাঁহার ভরসা, সর্ব্ববিষয়ে তিনি তাঁর নূতন বন্ধুর অনুগামী হইবেন। ডোনাল্ড ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না যে, অসিতনাথ জমীদারী দর্শনের উপলক্ষে প্রধূমিত নীল-বিদ্রোহের কারণানুসন্ধানে আসিয়াছেন।

তার পর বাহিরে আসিয়া উভয়ে পূর্ব্ব পরিচয় স্বীকার করিলেন। দীনেন্দ্রের তাহাতে কুণ্ঠার সীমা ছিল না, কিন্তু অসিতনাথ হাসিয়া উঠিলেন,—ছেলে বেলায় অমন কত হয়! এই সময়ে ধীরে ধীরে দীনেন্দ্রের চরিত্রে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে বাল্যসঙ্গী এবং মেম সাহেবদের প্রতি পূর্ব্ব অনুরাগের হ্রাস হইতেছিল। অনুতপ্ত হৃদয়ে দীনেন্দ্র বলিলেন,—"তখন যদি আপনার সৎপরামর্শে চল্‌তাম ত

অধঃপাত আমার হতো না!" সুতরাং মনের যে অবস্থায় মানুষ সহসা জাগ্রত হইয়া বিমল প্রীতির জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হয়, ঠিক সেই সময়ে দীনেন্দ্র অসিতনাথের সংসর্গ লাভ করিলেন।

দীনেন্দ্র দেখিলেন, অসিতনাথ কয় বৎসরে পরম সুন্দর যুবা পুরুষ হইয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণা এবং সর্ব্বত্রগামিনী। দেশীয় এবং বিদেশীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে, সর্ব্ববিধ ক্রীড়া কৌতুকে তাঁহার দিব্য অধিকার জন্মিয়াছে। শেষোক্ত গুণের জন্য বিশেষতঃ সাহেব এবং বিবি মহলে তাঁহার ভারি পসার। ডোনাল্ড দম্পতিও সেই কারণে তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কাজেই দুই চারি দিনের ঘনিষ্ঠতার পর দীনেন্দ্র অসিতনাথের গোঁড়া হইয়া উঠিলেন। বুঝিয়া ডোনাল্ড সাহেব এক দিন নির্জ্জনে তাঁহাকে বলিলেন, "দীনেন্দ্র, তুমি বোধ করি জান না, এই যুবা আজিও অবিবাহিত। সে দিন আমাদের প্রশ্নে বলিয়াছিলেন, মনোমত পাত্রী না পাওয়ায় বিবাহ করেন নাই। তাই মিসেস্ ডোনাল্ডের সঙ্গে যুক্তি করে আমি তোমায় এবং মিস্ ভর্জ্জিনিয়াকে চিঠি দিয়াছিলাম। সুরবালার সঙ্গে ইঁহার বিবাহ দিলে কেমন হয়? সে চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না?"

দীনেন্দ্র এই প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "এই বিবাহ হলে সকল দিকেই সুখের হবে। কিন্তু প্রথম কথা, সুরবালার সম্মতি,—সে যে স্থিরসংকল্প করে

বসে আছে, বিধবাতে আর তাতে কোন তফাৎ নেই, অতএব তার বিবাহ হতেই পারে না, এর উপায় কি? মিস্ ভার্জ্জিনিয়াকে যে আপনি লিখেছিলেন, আমার স্ত্রীর দ্বারা সুরোর মত পরিবর্ত্তন হতে পারে, সে অসম্ভব কথা। তাই আমরা সে চেষ্টা আদৌ পাইনি। তবে একটা সুযোগ সম্প্রতি আপনা আপনি উপস্থিত হয়েছে।”

ডোনাল্ড সাহেব সাগ্রহে জানিতে চাহিলেন, কি সে সুযোগ। দীনেন্দ্র আবার বলিলেন,

“মা আমায় নূতন বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিতে অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে সর্ব্বদা সুরোর সঙ্গে আমাদের মিলিবার মিশিবার সুবিধা হবে। আমি অনায়াসে তার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে তার মত পরিবর্ত্তন করতে পারব। অন্ততঃ চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।”

ডোনাল্ড সাহেবের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি দীনেন্দ্রের পিঠে গোটাকতক আদরের চাপড় মারিলেন, এবং বুঝাইলেন, এই সুযোগ কোন মতে উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু তিনি বিচার বিতর্কের উপর কোনও ভরাভর করিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সুরোর পণভঙ্গের একমাত্র উপায় প্রেম। দেবতারা যোগী ঋষিদের ধ্যানভঙ্গের জন্য সম্মোহন শরের আশ্রয় লইতেন। ডোনাল্ড সাহেব এ ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দীনেন্দ্রনাথ অসিতনাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া কুণ্ডলায় লইয়া গেলেন। বড় আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। উভয়ে প্রায় প্রত্যহ হয় শীকারে নয় নদীবিহারে যান। জলভ্রমণ বরেন্দ্র-ভূমির একটা বিশিষ্ট আমোদ, এবং বর্ষার কয় মাস পদ্মা নদীর কল্যাণে আমোদপ্রিয় লোকের তাহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অসিতনাথ যখন কুণ্ডলায় আসিলেন, বর্ষার তখন শেষাবস্থা। তথাপি "ছয়লাফের" দিন ছিল। জল নামিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রান্তর সকলের তখনও মগ্নাবস্থা। ক্বচিৎ দুই চারিটি খদির গাছ ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে সেই বারিরাশি মধ্যে জাগিয়া আছে,—স্থানে স্থানে হরিৎবর্ণ ধান্যক্ষেত্র কৃষিজীবীকে আশা ভরসা দিতেছে।

"ছয়লাফের" কথা যদি উঠিল, "যাগের গানের" একটা পরিচয় না দিলে পালা অসম্পূর্ণ হয়। বাবুরা বোটে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন,—ওদিকে তাঁহাদের সম্মুখে ভিন্ন নৌকায় ঢোল এবং রসনচৌকী সহযোগে "যাগের গান" নীচে বারিরাশি, ঊর্দ্ধে প্রায় মেঘশূন্য আকাশতল কম্পিত করিতেছিল। মূলগায়েন শ্রীরাধিকার বিরহমুখে গাহিল,

কাল যমুনার জল, তল তল ছল ছল,
কেন এত সুশীতল কাণু বিহনে।
কেতকী কদম্ব ফোটে, বনে কেকারব ছোটে,
ভরা ভাদরের ব্যথা তারা কি জানে॥

এই সময়ে "নীলদর্পণ" বাহির হওয়ায়, দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট্ সম্পাদক ক্ষণজন্মা হরিশচন্দ্রের সঙ্গে অসিতনাথের বন্ধুত্ব ছিল। হরিশ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, দুঃখী প্রজাদের নামে রাজধানীতে যে হাহাকার উঠিয়াছে, স্বয়ং তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু নিজের জমীদারীতে নীলের হাঙ্গামা ছিল না। প্রকাশ্য অনুসন্ধানের অবৈধতা অনুভব করিয়া হরিশ বাবু তাহা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব দীনেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ অসিতনাথ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুণ্ডলায় আসিয়া তিনি দীনেন্দ্রের আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মত স্রোতে একেবারে ভাসিয়া যাইতেন না। শীকার এবং নৌভ্রমণের সময় সুবিধা পাইলেই, তিনি নীলকরদের কার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার ধারণা হইল, বরেন্দ্রভূমির নিরীহ গরিব প্রজারা সহজে বিদ্রোহী হয় নাই। প্রজাদের মুখে তাহাদের দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে অনেক সময় অসিতনাথের চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। অকাতরে তিনি তাহাদিগকে অর্থদান করিতেন।

এই প্রকার কারণে রাইয়ৎমহলে অসিতনাথের ভারি সুখ্যাতি হইল। দীনেন্দ্র এই যুবা পুরুষের মহত্বের পরিচয় যত লাভ করিতে লাগিলেন, তাঁহার উপর তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা ততই বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দীনেন্দ্র অসিতনাথের সেই প্রজাসহানুভূতিতে অন্তরের সহিত যোগ দিলেন। এই সময়ে রাজসাহীর অনেক যুবক জমীদার নীলকর অত্যাচার দমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দীনেন্দ্র,অসিতনাথের উদাহরণ এবং পরামর্শে স্থির করিলেন,সাবালক হইয়া যথাসাধ্য ইহার প্রতি-বিধান করিবেন। এই সঙ্কল্প দীনেন্দ্র পরে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুণ্ডলায় আসিয়া অসিতনাথ বাড়ীতে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, যথাসময়ে তাহার উত্তর আসিল। মাতার পত্রে তিনি জানি-লেন, তাঁর এক মাসতুতো ভগিনীর শ্বশুরালয় সেখানে। শুনিয়া দীনেন্দ্র কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, মাতা এবং পত্নীর কাছে গেলেন। তখন পরিচয়ের ধূম পড়িয়া গেল, এবং দেখা গেল, দীনেন্দ্র অসিতনাথের এক মাতৃস্বসৃকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

এই কুটুম্বিতা আবিষ্কার করিয়া দীনেন্দ্র সহসা যখন অসিতনাথকে মধুররসের বাছা বাছা গালিগুলি উপহার

দিলেন, তখন তিনি সেই গ্রাম্য ভদ্রতার অর্থ গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। উত্তরে ভ্রূ-যুগল কিছু কুঞ্চিত হইল, এবং মুখে চোকে একটা রক্তিম রাগ ফুটিয়া উঠিল। তখন দীনেন্দ্র বুঝিলেন, নিজের শ্যালাকেও বিনা নোটীশে "শ্যালক" বলিলে মধুর রস অম্লরসে পরিণত হইতে পারে। অপ্রতিভ হইয়া দীনেন্দ্র সকল খুলিয়া বলিলেন, এবং অসিত-নাথ ততোধিক অপ্রতিভ হইয়া হাস্য কৌতুকে যোগ দিলেন।

কুসুমমালা চিরদিন পদ্মাপারে আছে, মাস্‌তুতো ভাই-দের দূরে থাক, জন্মাবধি কখন মাতৃস্বসাদিগকে দেখে নাই। কি করিয়া অসিতনাথের সম্মুখে বাহির হইয়া তাঁহাকে দাদা বলিবে, এই ভাবনায় তাহার দিনমান কাটিল। শাশুড়ী বলিলেন,"সে কি বউমা, আর কেউ নয়, নিজের মাস্‌তুতো ভাই, আমরা হলে এতক্ষণ ছুটে যেতাম।" জলযোগের আয়োজন করিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী অতঃপর কুটুম্বপুত্রকে সমা-দরে অন্দর মহলে আহ্বান করিলেন।

নির্ভাবনায় দীনেন্দ্রের একটা ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহার বিবেচনায় প্রধান অন্তরায় দূর হইল। সে কথা তিনি ডোনাল্ড দম্পতিকে জানাইলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দীনেন্দ্রের নূতন বাড়ীতে কুসুম এবং সুরবালার প্রত্যহ দেখা সাক্ষাৎ হইত। তার উপর মিসেস্ ভার্জ্জিনিয়া কিছু একটা মতলব আঁটিয়া পুরাতন ইস্কুল গৃহ ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর পড়াশুনার জন্য নূতন বাড়ীর একটি প্রশস্ত কক্ষ নির্দ্ধারিত হইল।

সুরবালা প্রথম প্রথম অসিতনাথের সম্মুখে বাহির হইতে সঙ্কুচিত হইত, কিন্তু কুসুমমালার আবদারে অল্পদিন মধ্যে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেও অভ্যস্ত হইল। ডোনাল্ড দম্পতির যত্নে সে যেরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিল, তখনকার দিনে বরেন্দ্রভূমে সচরাচর পুরুষদের পক্ষেও তাহা দুর্ল্লভ। সুতরাং সুরোর চরিত্রে লজ্জা এবং বিনয়ের যথেষ্ট সমাবেশ থাকিলেও জ্ঞানগৌরব কিছু ছিল না, এমন বলিতে পারি না। নিজের মধুর চরিত্র গুণে সে সকলকে স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়াছিল বটে, কিন্তু অবিশ্রান্ত জ্ঞানচর্চ্চায় তাহার হৃদয়ে যে সকল আকাঙ্ক্ষা এবং আশার সঞ্চার হইয়াছিল, এ সংসারে আর কেহ তাহার অংশভাগী ছিল না। ধ্বনি যেমন প্রতিধ্বনি খুঁজিয়া বেড়ায়, হৃদয় তেমনি সহৃদয়তার অন্বেষণ করে। মিস্ ভার্জ্জিনিয়াতে সুরবালা ঠিক সে টুকু পাইত না।

ইহার প্রধান কারণ, সকল তাতেই মেম্ সাহেব খৃষ্টধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন করিয়া হিন্দুদের অপকর্ষ দেখাইতে ভাল বাসিতেন। ইদানীং দুই জনে খুব তর্ক বাধিয়া যাইত। অসিতনাথের সঙ্গেও মেম্ সাহেবের প্রায় সেইরূপ ভাব, সমাজ এবং ধর্ম্মবিষয়ে কথা উঠিলেই তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হইত। সুরো দেখিত, অসিতনাথের সঙ্গে তার বিস্তর মত ঠিক মিলিয়া যায়। মেম্ মধ্যস্থ মানিলে সুরবালার চোকে মুখে লজ্জার রক্তিম রাগ ফুটিয়া উঠিত, তার পর মৃদু হাসিয়া অন্যের অশ্রাব্য স্বরে তাঁহাকে বলিত, "বেশ ত মেম্ সাহেব আমারও ঐ মত।"

এইরূপে সুরবালা এমন এক হৃদয়ের সাক্ষাৎ পাইল, যাহা কতকটা তাহার নিজের অনুরূপ। এ অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ সঞ্চার অনিবার্য্য। সুরো অসিতনাথের সকল কাজ ভক্তের চক্ষে দেখিত, তন্ময় হইয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথা গুলি শুনিত। দীনেন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিতেন। ক্রমে তিনি কুসুমমালাকে অনুরোধ করিলেন, স্পষ্ট করিয়া সুরোর মত জিজ্ঞাসা করে, অসিতনাথকে সে ভালবাসে কি না।

ঠাকুরঝির কাছে কুসুমের কিছুই গোপন ছিল না। তাহার দার্ঢ্যের উপর কুসুমের এমনই অটল বিশ্বাস যে, সে ধ্রুব জানিত, কিছুতে সুরো বিবাহে সম্মত হইবে না। তথাপি স্বামীর উপর্য্যুপরি অনুরোধ উড়াইতে না পারিয়া একদিন সুরোর কাছে কথা পাড়িল।

কুসুম যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। সুরোর এমন রাগ সে আর কখন দেখে নাই।

এই ঘটনায় সুরবালা আত্মহৃদয় পরীক্ষা করিবার অবসর পাইল। সে বুঝিল, তাহার জ্ঞানানুরাগ অন্যের চক্ষে প্রেমানুরাগের লক্ষণমাত্র, এবং সেই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দীনেন্দ্র বিবাহের প্রসঙ্গ করিতে সাহসী হইয়াছেন। অন্যে তাহাকে এমন দুর্ব্বল ভাবিতে পারে, এই চিন্তায় সুরো রোষে অভিমানে ফুলিতে লাগিল। বড় তরফে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। সে তরফের কেহ কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেও উত্তর পাইত না।

এতটা বাড়াবাড়ি কুসুমের অসহ্য বোধ হইল। সহসা সে একদিন আসিয়া সুরবালার শয়নগৃহে দেখা দিল। বউকে দেখিয়া ঠাকুরঝি প্রথম একচোট হাসিলেন বটে, কিন্তু তার পর তার কোলে মাথা রাখিয়া বিহ্বল বিবশ হইয়া রোদন করিলেন। অপ্রতিভ হইয়া কুসুম বলিল, "তা অত দুঃখ করিস্ কেন ভাই, তোর দাদা বুঝ্‌তে না পেরে একটা কথা না হয় বলেই ফেলেচে! তার পর কত যে অপ্রস্তুত হয়েচে, তার আর কি বল্‌বো।"

অনেকক্ষণ পরে সুরো প্রকৃতিস্থ হইল। বলিল, "বউ! তোতে আর দাদাতে আমায় যে এত ভালবাসিস্, আমি তার অযোগ্য। আমার দুঃখ, আমি আমার জীবনটা ঠিক বাবার মনের মত গড়ে তুল্‌তে পার্‌চিনে।"

কুসুম তাহাকে সান্ত্বনা করিল। দেখিল, কয় দিনের মানসিক ক্লেশে সুরো আধখানি হইয়া গিয়াছে

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অসিতনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। দীনেন্দ্র জানিলেন, মনটুকু তাঁর কুণ্ডলায় পড়িয়া রহিল।

আর সুরবালা? সেই অবধি সুরবালা বড় তরফে আর পদার্পণ করিল না বটে, কিন্তু কিছুদিনের অদর্শনেই সে বুঝিল, অসিতনাথের প্রতি অনুরাগ ঠিক জ্ঞানানুরাগ নহে। ধীরে ধীরে তাহার অজ্ঞাতসারে, হৃদয়ে যেখানে ভালবাসার স্থান, সেখানে অতি নিভৃতে অসিতনাথের দেবোপম মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তখন আপনার দৌর্ব্বল্যে সুরো আপনি অভিভূত হইল। চিরদিন নিজের উপর ভারি একটা বিশ্বাস ছিল, দেখিল সেটা ভুল। হৃদয়স্থিত বাঞ্ছিত মূর্ত্তি উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে সুরবালা প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্তু দেখিল, সহসা তাহা অসম্ভব।

আপনার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করিয়া সুরো যখন ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিল, কুসুম তখন তাহাকে দেখিতে আসিল। সেই দিন প্রাতে কি ভাবিয়া জানি না, সুরো পিতার তৈল-চিত্র দর্শন করিতে গিয়াছিল। চক্ষে চক্ষে মিলন হইলে

সে অবনতমুখী হইল—তাহার মনে হইল, পিতা সজীব হইয়া বলিতেছেন, "তুই এত দুর্ব্বল, তা কখন ভাবি নাই!" সখীর সঙ্গে মিলন হইলে সুরো যে বিহ্বল বিবশ হইয়া কাঁদিল, তাহার অনেক অর্থ। কুসুম তাহার কিছুই বুঝিল না।

সেই রোদনের কথা শুনিয়া মিস্ ভার্জ্জিনিয়া সুরোর বারণ না মানিয়াও তাহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সে কেবল হাস্য পরিহাস করিল। মেম লেখা পড়ার কথা পাড়িলে বলিল, ইংরেজী পড়িয়া তাহার মতিগতি অহিন্দু রকমের হইয়া উঠিতেছে। তাহার জীবনের যে ব্রত ব্রহ্মচর্য্য, এত দিনকার শিক্ষা ঠিক্ তাহার বিরোধী হইয়াছে। অতএব এখন হইতে সে আর বাটীর বাহির হইয়া ইস্কুলে পড়িতে যাইবে না। মেম দেখিলেন, সুরো কুমারীর বেশ ত্যাগ করিয়া বিধবা সাজিয়াছে। হিন্দু বিধবার শুভ্র পবিত্র বেশ, মেমের চক্ষে মন্দ দেখাইতেছিল না। কিন্তু ভগী দাসী কাঁদিয়া কাটিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছিল।

এ দিকে সুরবালার সাবালিকা হইতে আর দেরিমাত্র নাই। ডোনাল্ড দম্পতি ইতিপূর্ব্বে মিস্ ভার্জ্জিনিয়ার চিঠিতে জানিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন যে, সুরোর সঙ্গে অসিতনাথের "কোর্টশিপ্" চলিতেছে। কিন্তু অসিতনাথের সহিত বিদায়সাক্ষাৎকালে তাহার কিছুই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। শিক্ষয়িত্রীর শেষ পত্রে যে সংবাদ ছিল, তাহা

বড়ই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। মিসেস্ ডোনাল্ড মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং কুণ্ডলায় অবতীর্ণ হইলেন।

তাঁহার সঙ্গে সুরোর যখন দেখা হইল, তখন তাহার বিষম অগ্নিপরীক্ষার অবস্থা। এক দিকে প্রেম—অসিতনাথ জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—অন্যত্র পিতার ভক্তিপ্রীতিময়ী স্মৃতি, আজীবনের ব্রত স্রোতে ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে। সুরো অন্যবার ডোনাল্ড-পত্নীকে দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়, এবারও তেমনি হইল বটে, কিন্তু আর কখন তাঁর সম্মুখে এত লজ্জানম্রমুখী হইত না। কথায় কথায় তাহার গণ্ডে অপূর্ব্ব রক্তিম রাগ দেখা দিতেছিল, চেষ্টা সত্বেও সুরো মাতৃস্বরূপা মিসেস্ ডোনাল্ডের স্নেহকোমল চক্ষুতে আপনার চক্ষু সম্মিলিত করিতে পারিতেছিল না। বহুদর্শিনী ডোনাল্ড-পত্নী বুঝিলেন, এ প্রেম!

মিসেস্ ডোনাল্ডের জেদে পড়িয়া সুরো আবার কুমারীর বেশ ধারণ করিল। মেম অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন, "মনে কর, আজ্ যদি তোমার মা জীবিত থাক্‌তেন, তা হলে তুমি কি তাঁর মনে ক্লেশ দিতে পারতে?" ভগীর কান্না সুরো উপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু এ অনুরোধ পারিল না।

সহাইয়া সহাইয়া ডোনাল্ড-পত্নী ক্রমে সুরোর কাছে বিবাহের প্রস্তাবও করিলেন। দেখিলেন, আগে যে বিবাহের নামে গর্জ্জিয়া উঠিত, এখন সে নতমুখী হয়। শেষে সুরো তাঁহাকে বলিয়া বসিল, সাবালিকা হইলে তবে এ বিষয়ে মতামত দিবে।

ইহাতেও মেমের আহ্লাদের সীমা রহিল না। হাসিয়া কাঁদিয়া তিনি সুরবালার গণ্ডে শত চুম্বন করিলেন। হায় রমণীহৃদয়! সর্ব্বত্র তুমি সমান স্নেহশীল!

ষড়্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কালেক্টর সাহেবের মেমের কাছে ভগীদাসী যে ইঙ্গিত পাইয়াছিল, তাহাতে তাহার আনন্দের সীমা ছিল না। এই কয় বছরে তাহার মাথার সামনের সব চুল সাদা হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহার স্বাভাবিক মিতভাষিতা প্রায় বাক্যসংযমব্রতে পরিণত হইয়াছিল। কেহ নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া সুধাইলে বলিত, "কি কথা কব ছাই! সুরোর জন্যে সংসারে টিকে থাকা, তা সে বিধবার মত হয়ে থাকূল, এখন আমার একমাত্র কাজ হরিনাম করা, মনে মনে তাই করি।" কিন্তু সুরো সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পাত্রকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে আন্দাজ করিয়া, ভগীদাসী সহসা বাঙ্‌ময়ী হইয়া উঠিল। ছেলেবেলা হইতে সুরোর জীবনে যত কিছু ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়াছে, ভগী পাচিকা ব্রাহ্মণঠাকুরাণীকে ধরিয়া রোজ তাহার খুঁটিনাটি পরিচয় দিতে লাগিল। কাজেই সুরো এক দিন হাসিয়া বলিল,—"ভগী বেটী, চিরকালটা চুপ চাপ থেকে বুড়ো বয়সে তোর কি এ বাতিকের রোগ হলো?

দেখিস্, ক্ষেপে উঠিস্‌নে যেন!” ব্রাহ্মণঠাকুরাণীর সে দিন মনে ছিল, যখন সুরবালা বিবাহের নামে গর্জ্জিয়া উঠিত। হাসিয়া বলিল, “মা, ভগী বেটীর কি এত দিন কথা কহার মুখ ছিল! আহা সুবচুনী করুন, বিয়েতে তোমার মন হোক্। তোমার কচি কাচা হলে তাদের ঘুম পাড়াতে মানুষ করতে বিস্তর কথার পুঁজি চাই। ভগী তাই এখন থেকে অভ্যাস করে রাখ্‌চে!”

ভগী অনেক কাল স্বহস্তে তাহার আদরের কুকীর চুল বাঁধিয়া দেয় নাই। তার কারণ, বড় হইয়া অবধি চুলের পারিপাট্যবিধানের দিকে সুরো তেমন মন দিত না। পরিচ্ছন্নতার জন্য যে টুকুর একান্ত দরকার, তাহা সে নিজেই করিত। এখন সাহস এবং দিন পাইয়া মহা আহ্লাদে ভগী আবার কুকীর সেই অসংযমিত কেশরাশির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিল। প্রত্যহ যথাসময়ে সে সর্ব্ব কার্য্য ত্যাগ করিয়া সুরবালার কৃষ্ণতড়াগতুল্য, বিসর্পিত কুন্তলদাম সুরভি তৈলে চিক্কণ করিয়া দিত। তৈলের প্রতি অনাস্থা সত্ত্বেও সুরো নতমুখে তাহা সহিয়া থাকিত! দেখিয়া কুসুম হাসিয়া অস্থির হইত। হাসিয়া সুরবালা বলিত, “বউ, এখন ভাবি, মেমের কাছে নরম হয়ে ভারি অন্যায় করেছিলাম। তিনি যে কিসে এতটা গোল করলেন, বুঝ্‌তে পারিনে। আমি তাঁকে কোন কথা ত দিই নি।” কুসুম ঠোঁট ফুলাইয়া সুরোকে ছোট্ট একটি কিল দেখাইল। মধুর ভ্রুভঙ্গী করিয়া

বলিল,—"বুঝেছি লো বুঝেছি! আমার চেয়ে তোর আপনার হলো কিনা কালেক্টর সাহেবের মেম! আচ্ছা, দিন পাই ত এক দিন আমিই আবার ননদ হব,—তখন দেখা যাবে!"

চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে ভগী এক দিন বলিল, "কুকী জমাদারকে আস্‌তে লিখ্‌লে হয় না?" সুরোর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার কৈশোরকালে কালেক্টর সাহেবের মুখে মুখে জমাদার যে দিন বিবাহের কথায় ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিল, সে দিন মনে পড়িয়া গেল। সেই প্রভুভক্ত, সুরোদিদিগত-প্রাণ জমাদারকে সে ভুলিয়া আছে! লজ্জিত হইয়া সুরবালা বলিল, "ভগী বেটী, বিষয় আমার হাতে এলেই সে আস্‌বে! তার আর দেরি নেই। কালই তাকে চিঠি লিখ্‌তে বল্‌ব।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

১২—সালের ১৬ই বৈশাখ, সুরবালার "বন্‌কিয়তে" পৌঁছিবার দিন। দেখিতে দেখিতে সে দিন আসিয়া পড়িল। ছোট তরফের সেই বৃহৎ অযত্নরক্ষিত বাটী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের মহিমায় কয় বৎসরে দিব্য সংস্কৃত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তাহা সুসজ্জিত করা হইতেছিল। অসংখ্য লোকজন কাযে কর্ম্মে ব্যস্ত, কেহ কাহারও খোঁজ খবর রাখে না। অতএব চারি জন "রেঁাওয়ানি" বাহক স্কন্ধে একখানি মলিন

খাটুলি যে লোহিত বস্ত্র এবং দেবদারুপত্রখচিত দেউড়িতে আসিয়া নাবিল, ইহা দ্বাররক্ষকদের সহিল না।

আরোহী অকালী সিং স্বয়ং—রুগ্ন ও ভগ্নদেহ, প্রায় উত্থানশক্তিরহিত। পাঁচ বৎসরের নির্ব্বাসনের পর অকালী আবার প্রভুর দেউড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। কাল পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, আজ পাঁচ বৎসর এক দিন। কৃষ্ণনামের মত যে দিন অহোরাত্র জপ করিয়া অকালী সিং পাঁচ বৎসরের দীর্ঘ দিবারাত্রি কোনরূপে কাটাইয়াছে, আজ্ সেই দিন। কিন্তু কোথায় তাহার সেই পূর্ব্বের কাঠ-কঠিন দেহ, কোথায় তাহার দুর্দ্দমনীয় মানসিক বল? তিলে তিলে অকালী জীবনভার বিসর্জ্জন করিতেছে। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে এই রোগের সঞ্চার, কিন্তু চিকিৎসা হয় নাই। অকালী বুঝিয়াছিল, বৃদ্ধ বয়সে এই রোগ,—শেষের সে দিনের আর দেরি নাই। তথাপি প্রভুকন্যাকে দেখিবার জন্য সে কোন মতে জীবন ধারণ করিল। সুরো দিদিকে দেখিবার জন্য প্রাণ তাহার আকুলি ব্যাকুলি করিতেছিল, কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কাছে নিজের প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করিয়া অকালী সিং ধৈর্য্যধারণ করিল। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে—আজ পাঁচ বৎসর এক দিন! প্রভুগৃহের সৌষ্ঠব শোভা দেখিয়া অকালীর রোগক্লিষ্ট মুখে আনন্দজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সাধ ছিল, প্রভুকন্যাকে দেখিতে দেখিতে জীবনভার বিসর্জ্জন করিবে, সে সাধ পূর্ণ হইতে বসিয়াছে। অতএব খাটুলিখানাকে

সটান দেউড়ীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দ্বারবানেরা যখন রেঁশমানি কাহার গুলার সঙ্গে "শ্বশুরা" ও "বনুই" সম্বন্ধ ধরিতেছিল, অকালী তখন বাহুর উপর ভর করিয়া বসিল, এবং "অক্‌সরের" যোগ্য—গম্ভীর স্বরে বলিল, "যানে দেও!"

খবর পাইয়া সুরবালা বালিকার মত ছুটিয়া আসিল—সঙ্গে ভগী দাসী। বালিকার মত সুরো তাহার সেই আদরের জমাদারের বুকে লুটাইতেছিল, অকালী সিংএর সে দশা দেখিয়া ভগী চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। নিজে অকালী হাসিতে হাসিতে কাঁদিতেছিল। তার ছোট্ট সুরো দিদি এত বড় হয়েচে! মহিমাময় সুকুমার ললাটএবং উন্নত বঙ্কিম নাসা—এ যে প্রভু প্রমথনাথেরই মত! অকালী সুরো দিদির কোলে মাথা রাখিয়া প্রমথনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

অকালী বলিল, "দিদি, তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে এসেছি। আমার কাছে গঙ্গাতীরের চেয়ে, তাই বাঞ্ছনীয়। দিদি চল, আমায় একবার প্রভুর মূর্ত্তির কাছে নিয়ে চল।"

সুরবালার আদেশে দ্বারবানেরা বৈঠকখানায় অকালী সিংকে লইয়া গেল।

প্রভুর তৈলচিত্র দেখিতে দেখিতে অকালী সিংহের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। যুক্তকরে নিমেষশূন্য, পূর্ব্বের সে জ্যোতিঃশূন্য চক্ষু দুটি তাহাতে স্থাপিত করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, তুমিই আমার চিরদিনের জাগ্রত দেবতা, আমি কিন্তু তোমার কোন আদেশ পালন করতে পারলাম

না।” স্থরোকে অকালী বলিল, “দিদি, ছেলে বেলায় স্বপ্ন দেখে একদিন তুমি বলেছিলে,—‘জমাদার, কে তোমায় আমার দেউড়ী থেকে নিতে এসেছিল!’ তুমি সে দিন আমায় চিরদিনের মত হারাবার ভয়ে কাতর হয়েছিলে। দিদি, পাঁচ বছরের পর তোমার জমাদার দেউড়ীতে ফিরে এসেছে। আর তাকে কোথাও যেতে দিও না!”

স্থরবালা বালিকার মত বিবশা হইয়া কাঁদিতেছিল। ভগী দাসী চোকের জল মুছিতে মুছিতে অকালী সিংহের ললাট হইতে শ্রমসিঞ্চিত ঘর্ম্মবিন্দু মুছাইয়া দিতেছিল।

অকালী আবার বলিল,—“ধরে রাখ্তে পারিবে দিদি? মৃত্যু নিশ্চয়, দুটো চারটে দিন যদি বাঁচি। কিন্তু তোমায় দেখে আমার মর্তে ইচ্ছে করে না।”

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্থরবালা সাবালিকা হইল। সেই উপলক্ষে ডোনাল্ড দম্পতি উৎসবের যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু যাহাকে লইয়া আনন্দ, সে কিছুতে বড় যোগ দিল না। স্থরো পিতার বৈঠকখানায় স্বহস্তে অকালী সিংহের রোগ-শয্যা রচনা করিয়া দিল, এবং চিকিৎসার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিবারাত্রি জমাদারের শুশ্রূষায় নিযুক্ত

রহিল। ভগী বলিত, "কুকী, তোমার সুদিনে লোকে আমোদ আহ্লাদ করতে এসেছে, এক এক বার' তোমার ওদের কাছে না গেলে ভাল দেখায় না।" সুরো চোকের জল মুছিয়া বলিত, "ভগীবেটী, জমাদারকে যদি বাঁচাতে পারি, তবে আবার আমোদ আহ্লাদ করবো।" ভগী প্রমাদ গণিল। সুরোর ছায়া দেখিলে সে তাহার মনের কথা বলিয়া দিতে পারিত। সে বুঝিয়াছিল, অকালী বাঁচিয়া উঠিলেও কুকী বিবাহে আর সম্মত হইবে না।—

এই সিদ্ধান্তের কিছু ভিত্তিও ছিল। উৎসবান্তে মিসেস্ ডোনাল্ড সুরবালার কাছে বিদায় হইবার আগে আবার বিবাহের কথা পাড়িলেন। তাহাতে অশ্রুত্যাগ করিয়া সুরো বলিল, "আপনাদের স্ত্রীপুরুষের কাছে আমি যে স্নেহ-ঋণে বদ্ধ আছি, কিছুতে তা শোধ করিতে পারিব না। আমার পিতা মাতা জীবিত থাকিলে এর বেশী তাঁরা কিছু করতে পারতেন না। কিন্তু আমি আপনাদের মনস্তুষ্টির কোন কাজ করতে পারলাম না।" মেমসাহেব এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না—স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্বামী শীঘ্র কাজ হতে অবসর গ্রহণ করে দেশে যেতে চান। তাঁর এবং আমার ইচ্ছা, তোমার বিবাহ তার আগে সম্পন্ন হয়। কেমন, ইহাতে তোমার কি মত?" সুরো উত্তরে বলিয়াছিল,—"এখন আমি বড় বিপদগ্রস্ত। পিতার মৃত্যুকালে তেমন জ্ঞান হয় নি, কিন্তু আমার

পিতৃতুল্য পুরাতন ভৃত্যকে হারাতে বসেছি। তাকে দেখে অবধি পিতৃশোক নূতন করে জেগে উঠেচে। বিবাহের কথা আমি এখন চিন্তা করতেই পারচিনে, মেম্‌সাহেব !"

বাস্তবিক, অকালী সিংহের প্রভুভক্তির উচ্ছ্বাসে সুরবালার হৃদয়ে বিপরীত তরঙ্গ উঠিতেছিল। তাহার রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া সুরো দেখিত, যখন তখন জমাদার প্রভু প্রমথনাথের তৈলচিত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুত্যাগ করিতেছে। রোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে হাসিয়া বলিত, "কেন কষ্ট সহিবার জন্য আমায় ফাঁকি দিয়া পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলে? দু চার দিনে আবার দেখা হবে! আর তোমায় একদণ্ড ছাড়ব না।"

এ অবস্থায় সুরবালাও পিতার সেই তৈলচিত্রে সজীব পিতৃমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিত। সেই দেবমূর্ত্তি, স্নেহপ্রফুল্ল অথচ গৌরবদৃপ্ত! কন্যাস্নেহে তন্ময়, অথচ কুলগৌরবরক্ষায় একান্ত ঈর্ষ্যান্বিত! ভ্রুকুটি করিয়া রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রমথনাথ বলিতেন—"দ্যাথ্ সুরো,—জমাদারের প্রভুভক্তি দেখে তুই পিতৃভক্তি শিক্ষা কর্। তুই বিবাহ করে আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিবি! ধিক্ তোকে! তুই এত দুর্ব্বল, তা আগে জান্‌তাম না।"

সুরবালার অনুপস্থিতে ভগী দাসী একদিন জমাদারকে ইঙ্গিতে জানাইল যে, এক অতি সুপাত্র জুটিয়াছে, তাহার সঙ্গে বিবাহ হইলে সুরো জীবনে সুখী হইতে পারিবে।

শুনিয়া অকালী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। রোগ সেই দিন হইতে অতিশয় বৃদ্ধি হইল।

সুরোকে অকালী বলিল,—"একটা কথা মনে রেখো দিদি, জমাদারের শেষ কথাটা মনে রেখো! পিতৃকুলে কালি দিও না। একি সত্য, তুমি বিধর্ম্মী সাহেবদের কথায় ভুলে বিবাহ করতে সম্মত হয়েচো?"

সুরো বলিল, "ভাই, এতদিন বাবার কথা মনে করে দিবার লোক ছিল না। তোমায় দেখে অবধি আমি তাঁর আদেশবাণী স্পষ্ট শুনতে পাচ্চি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম হয়ে উঠ। আমি বিবাহ করব না ভাই—তোমার সেই ছেলেবেলার সুরো দিদিই থাকব। তুমি আমায় এ প্রলোভন, এ পাপের পথ থেকে নিয়ে চল।"

সেই রাত্রে অকালী সিং বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। মরিবার আগে হাস্যপ্রফুল্ল মুখে সুরোকে বলিয়াছিল, "প্রভু প্রমথনাথকে আমি দেখ্‌তে পাচ্চি। তাঁর আশীর্ব্বাদে তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার হবে।"

সুরবালা ইহজীবনে আর কখন বিবাহের কথা ভাবে নাই। তাহার দগ্ধ জীবন-পুষ্পবৃক্ষে অকস্মাৎ একবার মুকুল দেখা দিয়াছিল—অকস্মাৎ অস্ফুট মুকুল শুকাইয়া গেল।